ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

আমাদের কথা

মাথার উপর আসমান, পায়ের নীচে জমীন। এই দুয়ের মাঝে আছে অসংখ্য সৃষ্টি। এসব আল্লাহ বানিয়েছেন আমাদের জন্য। মানুষের জন্য। এজন্য সূর্য আমাদেরকে আলো ও তাপ সর্বরাহ করে। রাতের অন্ধকারে চাঁদ দেয় কিরণ। খেতের সফল, নদী–নালার মাছ ও বিভিন্ন স্থলজ প্রাণী আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে। পানি আমাদের তৃষ্ণা মেটায়। বাতাস আমাদের জীবন সচল রাখে।

প্রশ্ন হচ্ছে দুনিয়ার সবকিছু মানুষের জন্য, তা হলে মানুষ কীসের জন্য? এই প্রশ্নের জওয়াব আল্লাহ কুরআন মাজীদে এভাবে দিয়েছেন–

আমি জিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদাত করার জন্য। [সূরা যারিয়াত : ৫৬]

কিন্তু মানুষ তার সৃষ্টিরহস্য ভুলে গেছে। তারা এখন দুনিয়া উপার্জন নিয়ে ব্যস্ত। এমন কি যেই মুসলমানের কাছে কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে, তারাও। উলামায়ে কেরাম তাদেরকে বিভিন্ন পন্থায় মূল কাজে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করছেন।

যেসব আলেমে দীন এই সময়ে ইসলামের দাওয়াতী কাজে খুব জোরদার মেহনত করছেন, তাঁদের মধ্যে সৌদী আরবের ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী অন্যতম।

তাঁর অনেকগুলো বইয়ের বাংলা অনুবাদ ইতোমধ্যে আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছি। এখন মানবসমাজের মূল কাজ আল্লাহর ইবাদাত নিয়ে লেখা তাঁর পুস্তক 'শুধু তাঁর ইবাদাবত' পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি।

ব্যক্তিগত জীবনে ড. আরিফী হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করে থাকেন। এজন্য এই বইয়ে সেই ধারায়ই আলোচনা পেশ করেছেন তিনি। আমরা তাঁর আলোচনা অক্ষুণ্ন রেখে অনুবাদ করেছি। তবে যেহেতু আমাদের দেশের বেশিরভাগ মুসলমান হানাফী মাযহাব অনুসরণ করে থাকেন। এজন্য মতবিরোধসম্পন্ন মাসআলায় আমরা টিকায় হানাফী আলেমদের অভিমত খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করে দিয়েছি। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমরা দলিল–প্রমাণ এড়িয়ে গিয়েছি। মনে রাখতে হবে, হানাফী মাযহাবের প্রত্যেক মাসআলাতেই কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দলিল বিদ্যমান রয়েছে।

বইটি পড়ে কেউ যদি আল্লাহর ইবাদাতের দিকে ফিরে আসেন, তা হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম আনসারী
মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন
১৯/০২/১৪৪০ হি. (২৮/১০/১৮ ইং)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে শুধু তারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদত হল ইসলামের পাঁচ রুকন। তন্মধ্যে প্রথম রুকন তথা ঈমান সম্বন্ধে আমার আগের পুস্তিকা اِرْكَبْ مَعَنَا [কবরপূজারী কাফের]-তে আলোচনা করেছি। এখানে বাকি চার রুকন তথা সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

আল্লাহ ﷻ-র নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন বইটিকে সবার জন্য উপকারী করেন এবং একান্তই তার জন্য কবুল করে নেন। আমিন!

এক মিনিটে নয়বার নিঃশ্বাস

এক ডাক্তার আমার নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। একবার তিনি একটি আই. সি. ইউ. রুমে এক রোগীর নিকট গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন, এক অশীতিপর বৃদ্ধ পড়ে আছেন বেডের সাদা চাদরের ওপর। মুখটা যেন তার নুরে চমকাচ্ছে।

ডাক্তার সাহেব বলেন, ' আমি তার ফাইলটা উল্টিয়ে দেখছিলাম। তার হার্টের অপারেশন হয়েছিল।'

রক্তক্ষরণে তার দেহ বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। মস্তিষ্কের একটি রগ অকার্যকর হয়ে গেছে। ফলে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে আছেন তিনি। নানা রকম যন্ত্রপাতি দেহে লাগানো। সেগুলোর একটি তার মুখে। কৃত্রিম শ্বাসের ব্যবস্থা। প্রতি মিনিটে নয়বার করে কৃত্রিম শ্বাস আসা-যাওয়া করছে।

পাশেই তার এক ছেলে বসা। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তার বাবা অনেক বছর ধরে এক মসজিদের মুআয্যিন ছিলেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। হাত নাড়ালাম; চোখের পাতা নাড়ালাম। কথা বললাম। কোনো সাড়া নেই।

তার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে তার ছেলে কথা বলতে লাগল। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। ছেলে বলছিল, ' বাবা! আম্মু ভাল আছেন। ভায়েরাও ভাল আছেন। মামা সফর শেষ করে দেশে ফিরেছেন।' ছেলে বলে যাচ্ছিল। অবস্থা আগের মতই–বৃদ্ধের কোনো সাড়া নেই। মেশিন প্রতি মিনিটে নয়বার করে শ্বাস পরিচালনা করতে পারছে।

হঠাৎ ছেলে বলে উঠল, 'বাবা! মসজিদ আপনার অপেক্ষায় আছে। অমুক ছাড়া কেউ সেখানে আযান দিচ্ছে না। তার আযানে অনেক ভুল। মসজিদে আপনার জায়গা খালি পড়ে আছে।'

মসজিদ আর আযানের কথা বলার সাথে সাথেই বৃদ্ধের বুক নড়ে উঠল। শ্বাস নিতে শুরু করলেন। মেশিনের দিকে তাকালাম। শ্বাসের গতি মিনিটে আঠারো দেখাচ্ছে। ছেলেটির দৃষ্টি সে দিকে যায়নি।

এরপর ছেলে বলল, 'আমার চাচাত ভাই বিয়ে করেছে। ভাই ডিগ্রি লাভ করেছেন।' বৃদ্ধ আবার নিথর হয়ে পড়লেন। শ্বাসের গতি নয়ে নেমে এল।

এটা দেখে আমি তার দিকে এগোলাম। মাথার নিকট দাঁড়িয়ে তার হাত, চোখ ইত্যাদি নাড়া দিলাম। সাড়া নেই। সবকিছুই স্থির। আমি বিস্মিত হলাম। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগলাম, 'আল্লাহু আকবার। হাইয়া আলাস্‌সালাহ। হাইয়া আলাল ফালাহ।' আর মেশিনের ডিসপ্লের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে রইলাম। দেখতে পেলাম, ডিসপ্লে মিনিটে আঠারো বার নিঃশ্বাস শো করছে।

লোকটার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে আছে।

কত সৌভাগ্যবান রোগী সে! বরং প্রকৃত অর্থে রোগী আমরাই! হ্যাঁ। কুরআন বলছে–

﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاۤءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْأَبْصَارُ. لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

এমনসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকির, সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে অমনোযোগী করে না। তারা ভয় করছে এমন দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে, যেন আল্লাহ তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান প্রদান করেন এবং নিজের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ করে আরও দান করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে অপরিমিত রিযিক দান করেন।' [সুরা নুর : আয়াত ৩৭-৩৮]

জাদুঘরে সালাত

আরেক বন্ধু তার নিজের ঘটনা আমাকে শুনিয়েছে। বলেছে, "আমি সুইডেনে ছিলাম। দু'জন প্রবাসী বন্ধুকে সাথে নিয়ে সেখানকার এক জাদুঘরে গেলাম। প্রাচীন বইপুস্তক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের জাদুঘর। টিকেট কেটে ভেতরে প্রবেশ করলাম। কিছু সময় ঘুরেফিরে দেখলাম। আসরের সময় হলে আমার এক সঙ্গী বলল, 'জনাব! চলুন, বাইরে গিয়ে সালাত পড়ে আসি।' অবাক হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে সালাত পড়ব না কেন?' সে বলল, 'হাহ্! ওদের সামনে সালাত পড়ব? না, না, তা হয় না। এটা খুবই কঠিন।' বললাম, 'কঠিন কেন?' সে বলল, 'আরে জনাব! সুইডিশদের সামনে সালাত পড়ব?!' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সুইডিশদের সামনে সালাত পড়ব। তাদের সামনে সালাত পড়ব না কেন? আমাদের সামনেই রাস্তাঘাটে তারা যা ইচ্ছে তা-ই করে বেড়ায়। সেটা কি তুমি দেখ না? আমাদের সামনেই সতর খুলে ফেলে। এতটুকু লজ্জাও তাদের হয় না। বেহায়াপনা করে বেড়ায়, আর এটাকেই তারা স্বাধীনতা বলে মনে করে। আর তাদের এ ধরনের স্বাধীনতার দিকে আমরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। তা হলে তাদের সামনে সালাত পড়ে আমরা এটাকে স্বাধীনতা ভাবব না কেন'?"

"মনের বিরুদ্ধে হলেও বন্ধুটি আমার কথায় রাজি হল। জাদুঘরের একপাশে চলে গেলাম আমরা। ক্বিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। কানে আঙ্গুল রাখলাম। চিৎকার করে উঠল আমার সঙ্গী, 'আরে, করছ কী!' বললাম, 'আযান দিচ্ছি।' খুবই অস্থির হয়ে উঠল সে। বলল, 'এখানে আযান দিচ্ছ!?' বললাম, 'হ্যাঁ, স্বাধীনতা আছে না?

এরা কি রাস্তাঘাটে গানবাজনা করে না? আর এটাকেই কি তারা স্বাধীনতা বলে না? তুমিও তো এটাকে স্বাধীনতা বল'।"

"এরপর আমি আযান দিলাম, নিচু স্বরে ইকামত বললাম এবং সালাত আদায় করলাম। এরপর জাদুঘর দেখা শেষ করলাম। লোকজন আমাদের দেখল। তারা দেখল, আমরা জামাআতের সাথে সালাত পড়ছি, তাকবির বলছি, তসবিহ পড়ছি, রুকু-সেজদা করছি। কিন্তু কোনো পুলিশ আমাদের ধরতে আসেনি, কোনো জরিমানাও করেনি, বা ধরে নিয়ে জেলেও পুরেনি। আসমানও মাটিতে পড়ে যায়নি। তা হলে লোকদের সামনে সালাত পড়তে লজ্জা কিসের? পার্কে বা পাবলিক প্লেসে সালাত পড়তে অসুবিধা কী?"

কোনো কোনো মুসলমান তো সফর বা রোগ কিংবা অন্য কোনো কারণ ছাড়াই, শুধু লোকদের সামনে সালাত পড়তে লজ্জা বোধ করার কারণে দু' সালাত এক করে ফেলে।

সালাত ইসলামের একটি রুকন, একটি মৌলিক বিষয়। প্রত্যেক রাসুলের শরিয়তেই এই সালাতের হুকুম ছিল।

আল্লাহ ﷻ-র নিকট এর মর্যাদা অনেক বেশি। তাই মে'রাজের রাতে আল্লাহ ﷻ তার নবী ﷺ-র ওপর এই সালাত ফরজ করেন। পবিত্র কুরআনের ৫৮ জায়গায় সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সালাতের আহকাম শেখার আগে পবিত্রতার আহকাম শিখতে হবে।

পবিত্রতার আহকাম

মুহদিস তথা অপবিত্র ব্যক্তি।

মুহদিস ব্যক্তির জন্য কয়েকটি কাজ নিষেধ। যেমন–

১. সালাত। অপবিত্র ব্যক্তি, যে কিনা অযু বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে তার অপবিত্রতা দূর করতে সমর্থ, তার জন্য সালাত পড়া নিষেধ। পড়লে তা শুদ্ধ হবে না, চাই সে ব্যক্তি শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত, অপবিত্র অবস্থায় তার সালাত পড়া ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত। এই সালাত আবার পড়তে হবে।

২. কুরআন স্পর্শ করা। কোনো কিছুর আড়াল ব্যতীত অপবিত্র ব্যক্তির জন্য তা স্পর্শ করা নিষেধ। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾

যারা পবিত্র, তারা ছাড়া আর কেউ তা স্পর্শ করবে না। [সূরায়ে ওয়াকেয়া : আয়াত ৭৯]

যারা এখানে পবিত্র ব্যক্তি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তাদের মতে পবিত্র শব্দটির মানে হল জানাবত বা অন্য কোনো ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র। আর যারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তাদের মতেও আয়াতের ইঙ্গিতের কারণে মানুষ এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, এবং অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ থাকবে। এটাই চার ইমামের মত।

৩. তাওয়াফ করা। অপবিত্র ব্যক্তির জন্য বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা হারাম। কারণ, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلَامَ

বাইতুল্লাহর তাওয়াফ হল সালাত [-এর মত]। তবে আল্লাহ সেখানে কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন। [সুনানুন আন-নাসায়ি]

৪. তদ্রূপ যে-ব্যক্তি জানাবতের [স্ত্রীসংগম ইত্যাদির] কারণে অপবিত্র, তার জন্য কুরআন না দেখে পড়াও নাজায়েয। তেমনিভাবে মসজিদে থাকাও তার জন্য নাজায়েয।

কাজায়ে হাজতের আদব

কোনো মুসলমান ওয়াশরুমে, যা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছে, প্রবেশ করতে চাইলে তার জন্য মুস্তাহাব হল বাম পা আগে দেওয়া এবং এই দোয়া পড়া–

بِسْمِ اللهِ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَ الْخَبَائِثِ

বিসমিল্লাহি, আউযু বিল্লাহি মিনাল খুবসি ওয়াল খাবায়েস

আর বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বের করবে এবং এই দোয়া পড়বে–

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَ عَافَانِيْ

গুফরা-নাকাল হামদু লিল্লাহিল্লাযি আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া আ-ফানী

আর এই সময় মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকবে, কোনো গাছের আড়ালে হোক, কিংবা প্রাচীর বা অন্য কিছুর আড়ালে হোক। ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে বসবে না। কারণ, এটা হারাম। আর পেশাবের ছিটা যেন গায়ে বা কাপড়ে না লাগে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য

আমাদের ধর্মের একটি গুণ হল স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তা হল এমনসব কাজ, যেগুলোর ব্যাপারে সকল নবী একমত। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ.

পাঁচটি বিষয় মানুষের স্বভাবজাত : ইসতিহদাদ [লজ্জাস্থানের পশম দূর করা], খতনা করা, গোঁফ কাটা, বগলের নীচের পশম উপড়ানো এবং নখ কাটা।

নবীজি ﷺ আরও বলেছেন–

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللِّحَى

তোমরা গোঁফ ছোট করো এবং দাড়ি ছেড়ে দাও [বড় হতে দাও]। [সহিহ বোখারি, মুসলিম]

ইসতিহদাদ : নাভির নীচের পশম কামানো, যা লজ্জাস্থানের চারপাশে থাকে। তা কামিয়ে হোক বা অন্য কোনোভাবে হোক, দূর করবে।

খতনা করা : লিঙ্গের অগ্রভাগের ওপর চামড়ার যে আবরণ থাকে, তা দূর করা। পুরুষদের জন্য তা ওয়াজিব, আর মহিলাদের জন্য সম্মানের কারণ।

গোঁফ ছোট করা এবং দাড়ি বড় করা : অর্থাৎ গোঁফ কেটে ফেলবে, বড় হতে দেবে না। আর দাড়ি কাটবে না; বরং বড় হতে দেবে। তবে এক মুষ্টি থেকে লম্বা হলে মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কাটা জায়েয।

নখ কাটা : অর্থাৎ নখ কেটে ছোট করা।

বগলের নীচের পশম দূর করা : বগলের নীচে যে পশম হয়, তা কেটে বা উপড়ে দূর করা।

চল্লিশ দিনের মধ্যেই এসব করা চাই। চল্লিশ দিনের বেশি পার করা জায়েয নেই।

অযুর আহকাম

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য ওঠ, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, মাথা মাসেহ করো এবং গিরাসহ পা ধৌত করো। আর যদি তোমরা অপবিত্র হও, তা হলে পুরো দেহ পবিত্র করে নাও। আর যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা সফরে থাক কিংবা তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা সেরে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, এরপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাটি দ্বারা মাসেহ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; বরং তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি নিজ নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। [সূরা মায়েদা : ৬]

অযুর পদ্ধতি নিম্নরূপ

মনে মনে অযুর নিয়্যত করবে। এরপর বিসমিল্লাহ বলবে। বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। না পড়লে গোনাহ হবে না। এরপর উভয় কব্জি তিন বার করে ধুবে। অযু করার সময় লজ্জাস্থান ধোয়া শর্ত নয়। কারণ, পেশাব-পায়খানার পরই তা ধোয়া হয়। অযুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এরপর তিন বার কুলি করবে। অর্থাৎ মুখের ভিতর পানি নিয়ে তা নেড়েচেড়ে বের করে দেবে।

এরপর তিন বার নাকে পানি দেবে। অর্থাৎ শ্বাসের সাথে নাকের ভিতর পানি টেনে নেবে। এরপর তা বের করে দেবে। পানি জোরে টেনে নেবে। তবে সিয়াম আদায়কারী হলে তা করবে না। কারণ, এতে পেটের ভিতর পানি যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এক অঞ্জলি পানি দিয়ে কুলি করলে ও নাকে পানি দিলেও অযু হয়ে যাবে।

এরপর তিন বার মুখমণ্ডল ধৌত করবে। মুখমণ্ডলের সীমারেখা হল, মাথার চুলের গোড়া থেকে নিয়ে থুতনির নীচের অংশ পর্যন্ত, এবং এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত। আর দাড়ি যদি পাতলা হয়, তা হলে তা ও তার নীচের চামড়া ধুয়ে নেবে। আর যদি ঘন হয়, তা হলে তার ওপরটা ধুবে। পানি দিয়ে তা খেলাল করা মুস্তাহাব। হাতের তালুতে পানি নিয়ে তা নীচের দিক থেকে দাড়িতে দেবে।

এরপর কনুইসহ উভয় হাত তিন বার ধুবে।

এরপর উভয় কানসহ মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করবে। মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করবে এবং পিছনের দিকে নিয়ে যাবে। এরপর হাতে বেঁচে থাকা পানি দিয়ে উভয় কান মাসেহ করবে।

এরপর টাখনুসহ উভয় পা তিন বার করে ধৌত করবে। টাখনু বলতে পায়ের গোছার নীচের উঁচু হাড়কে বোঝায়। আর বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে পায়ের আঙ্গুলগুলো খেলাল করবে।

অযুর পরের দোয়া

অযুর পর এই দোয়া পড়বে[১]–

أَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُوْلُه ، سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوْبُ إِلَيْكَ .

আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবি হামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

সতর্কতা

অযুর অঙ্গগুলো ধারাবাহিকভাবে পর পর ধোয়া ওয়াজিব।

অযুর পর কাপড় দিয়ে অঙ্গগুলো মুছে নেওয়া জায়েয।

অযুর অঙ্গগুলো এক বার করেও ধোয়া জায়েয, দু'বার করেও ধোয়া জায়েয। তবে তিন বার করে ধোয়া সুন্নাত। মাথা এক বারই মাসেহ করবে।

অযুর অঙ্গগুলোর সবখানেই যেন পানি পৌঁছয়, কোনো অঙ্গ যেন শুকনো না থাকে। নবীজি ﷺ একব্যক্তিকে দেখলেন, তার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনো রয়ে গেছে, পানি পৌঁছয়নি। তিনি বললেন,

إِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ

'পুনরায় গিয়ে সুন্দর করে অযু করে এসো।'

ক্ষতস্থানের ওপর যদি পট্টি বা ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকে, তা হলে তার ওপরই মাসেহ করবে। আর যদি ক্ষতের ওপর পট্টি বা ব্যান্ডেজ না থাকে, যেমন পোড়া জায়গা, তা হলে যতটুকু সম্ভব ধুয়ে নেবে। এরপর তায়াম্মুম করবে।

অযুর পর দু' রাকআত সালাত পড়া সুন্নাত।

---

১. সহিহ মুসলিম, তাবারানি

মোজার ওপর মাসেহর আহকাম

মোজা বলতে পায়ে চামড়া বা চামড়ার মত বস্তুর তৈরী যা পরিধান করা হয়, তাকে বোঝায়।

মাসেহ করার পদ্ধতি

হাতের ভেজা আঙ্গুল ফাঁক করে মোজার ওপরিভাগে পায়ের আঙ্গুলের দিক থেকে পায়ের গোছার দিকে টেনে আনবে, পিছনে বা নীচের দিকে টেনে নেবে না।

আলী ﵁ বলেন, 'আমি নবীজি ﷺ-কে মোজার ওপরিভাগে মাসেহ করতে দেখেছি।'

হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-এর সত্তরজন সাহাবি থেকে শুনেছি, রাসুল ﷺ মোজার ওপর মাসেহ করেছেন।'

ইমাম আহমদ ﵀ বলেন, 'মাসেহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে নবীজি ﷺ-র চল্লিশটি হাদিস রয়েছে।'

মোজার ওপর মাসেহর শর্ত

১. মাসেহর মুদ্দত

মুকিম ব্যক্তি এক দিন এক রাত মোজার ওপর মাসেহ করতে পারবে, আর মুসাফির ব্যক্তি পারবে তিন দিন তিন রাত। এই এক দিন বা তিন দিনের হিসাব শুরু হবে অযু করে মোজা পরিধানের পর প্রথম বার অযু ভঙ্গের পর থেকে। আলী রাযি. বলেন–

جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَ يَوْمًا وَّ لَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ

রাসুল ﷺ মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত নির্ধারণ করেছেন। [সহিহ মুসলিম]

২. পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে। মুগিরা বিন শো'বা রাযি. নবীজি ﷺ-এর অযুর আলোচনা করে বলেন, "তিনি তার মাথা মাসেহ করলেন। এরপর আমি তার মোজাদুটি খুলতে গেলাম। তিনি বললেন, 'ওগুলো থাক। পবিত্র অবস্থায়ই পরেছি। এরপর তিনি সে-দুটোর ওপর মাসেহ করলেন'। [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

৩. ফাটা মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েয। সুফয়ান সওরি রহ. বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা তোমার পায়ে ঝুলে থাকে, তার ওপর মাসেহ করো। মুহাজির ও আনসারদের মোজা তালি লাগানো ও ছেঁড়াফাটাই ছিল।

৪. অযু করে যদি মোজা পরিধান করে, এবং সালাত পড়ার আগেই তা খুলে ফেলে, তা হলে তার অযু বাকি থাকবে। পুনরায় অযুও করতে হবে না, পা-ও ধুতে হবে না।

৫. ঘুমে বা যে-কোনো ভাবে যদি গোসল ফরজ হয়, তা হলে গোসলের সময় মোজা খুলে পা ধোয়া ওয়াজিব। ফরজ গোসলে মোজার ওপর মাসেহ করলে তা যথেষ্ট হবে না।

হাত-পা বা অন্যত্র কোনো জায়গা ভাঙা থাকলে বা অন্য কোনো কারণে সেখানে পট্টি লাগানো হলে, সেটার ওপর মাসেহ করা জায়েয। তদ্রূপ সেটার ওপর যে কাপড় বাঁধা থাকে, তার ওপরও মাসেহ করা জায়েয।

পট্টির ওপর মাসেহ করার নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। বরং তা খুলে ফেলা পর্যন্ত মাসেহ করতে থাকবে। কারণ, প্রয়োজনের তাগিদে এই মাসেহ বৈধ হয়েছে। কাজেই যতক্ষণ প্রয়োজন থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাসেহ করতে থাকবে। পট্টির ওপর মাসেহ বৈধ হওয়ার প্রমাণ হল জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﵁-র হাদিস। তিনি বলেন, "আমরা এক সফরে ছিলাম। এ সময় আমাদের এক সাথির মাথায় পাথরের আঘাত লাগল। তার মাথা ফেটে গেল। এরপর তার স্বপ্নদোষ হল। সে তার সাথিদের জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জন্য তায়াম্মুম করার সুযোগ আছে বলে কি তোমরা মনে কর?' তারা বলল, 'তুমি তো পানি ব্যবহার করতে সক্ষম। তাই তোমার জন্য এর বৈধতা আছে বলে আমাদের মনে হয় না।' এতে সে গোসল করল। ফলে সে মারা গেল। রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে আমরা বিষয়টি জানালে তিনি বললেন,

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا

'ওরা তো ওকে মেরে ফেলেছে! আল্লাহ ওদের মেরে ফেলুন! তারা যখন জানে না, তখন কি জিজ্ঞাসা করতে পারল না? না-জানার চিকিৎসা হল জিজ্ঞাসা করা। তার জন্য তায়াম্মুমই যথেষ্ট ছিল। যখমের ওপর একটুকরো কাপড় বেঁধে সেটার ওপর মাসেহ করলেই হত'। [সুনানে আবু দাউদ]

অযু ভঙ্গের কারণ

অযু-ভঙ্গকারী বলতে এমনসব বিষয় বোঝায়, যেগুলো ঘটলে অযুকারী ব্যক্তি 'মুহদিস' তথা অযুহীন হয়ে যায়। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া; যেমন পেশাব, পায়খানা বা বায়ু।

২. বোধশক্তি হারিয়ে ফেলা : উন্মাদনা, সংজ্ঞাহীনতা, নেশা বা গভীর ঘুমের অবস্থায় অনুভূতিশক্তি এতটুকু নিস্ক্রিয় হয়ে যাওয়া যে, তার শরীর থেকে কিছু বেরিয়ে গেলে টের পায় না। তবে হালকা ঘুমে, যে-ঘুমে অনুভূতি লোপ পায় না, অযু ভঙ্গ হবে না।

৩. উত্তেজনার সাথে সরাসরি হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা। নিজের লজ্জাস্থান হোক বা অন্যেরটা।[২] রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে সে যেন অযু করে। [ইবনে মাজা, সুনানে নাসায়ী]

৪. উটের গোস্ত, ভুঁড়ি, কলিজা খাওয়া।[৩] কেননা রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা হয়েছিল–

أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبْلِ؟ قَالَ نَعَمْ

---

[২] এক্ষেত্রে অযু ভঙ্গ না হওয়ারও হাদিস আছে।

[৩] এক্ষেত্রেও অযু ভঙ্গ না হওয়ার হাদিস আছে।

আমরা কি উঠের গোস্ত খেয়ে অযু করবো? তিনি ﷺ বললেন, হাঁ। [সহিহ মুসলিম]

৪. আরও কিছু কারণ আছে, যেগুলো অযুভঙ্গের কারণ হওয়া নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সেগুলোর ক্ষেত্রে অযু করে নিয়ে মতবিরোধ থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাই উত্তম।

মুমিনের জান্নাত তার মেহরাবে

একব্যক্তি হাসপাতালে গেল। দেখতে পেল, এক রুগ্ন ব্যক্তি বিছানায় পড়ে আছে। পুরো দেহ অসাড়। শুধু মাথাটা নাড়াচাড়া করতে পারছে। তার অবস্থা দেখে ওই ব্যক্তির মনে মমতা জেগে উঠল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ' আপনার মনে কি কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে? থাকলে বলুন, পূরণ করতে চেষ্টা করব।' রোগী বলল, ' আমার বয়স চল্লিশের মত। পাঁচ সন্তানের পিতা আমি। সাত বছর ধরে এ বিছানায় শুয়ে আছি। বিশ্বাস করুন! আমি চলাফেরা করতেও চাই না; সন্তানদের দেখার আকাঙ্ক্ষাও আমার নেই। অন্যসব মানুষের মত ভোগবিলাসের জীবনও চাই না। শুধু একটি তামান্না আমার যদি আল্লাহ ﷻ-র সামনে মাটিতে কপালটা রেখে সেজদা করতে পারতাম! প্রভুর সামনে নিজের লাঞ্ছনা প্রকাশ করতে পারতাম! মানুষের মত আমিও যদি সেজদা করতে পারতাম!'

প্রিয় ভাই! তুমি এখন সুস্থ। রোগবালাই থেকে মুক্ত। আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশ মুতাবিক তুমি কি তোমার সালাত কায়েম করেছ?

গোসলের আহকাম

গোসল বলতে 'হদসে আকবার' তথা জানাবত, হায়েয বা নেফাস থেকে পবিত্রতা অর্জন করাকে বোঝায়। যেমন আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন—

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا﴾

তোমরা যদি অপবিত্র [জুনুবি] হয়ে থাক, তা হলে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে নাও। [সূরা মায়েদা : ৬]

নিম্নবর্ণিত কারণসমূহ পাওয়া গেলে গোসল ফরজ হয়—

১. জাগ্রত অবস্থায় বা ঘুমে বীর্য বের হলে। কাজেই ঘুম থেকে জেগে কেউ যদি বীর্যের চিহ্ন দেখতে পায়, তার ওপর গোসল ওয়াজিব হবে। আর ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যদি মনে পড়ে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে, কিন্তু তার থেকে কিছুই বের হয়নি, আর দেহেও কোনো চিহ্ন নেই, তা হলে তার ওপর গোসল ওয়াজিব হবে না।

২. সঙ্গাম করলে গোসল আবশ্যক হবে, যদিও বীর্যপাত না হয়।

৩. হায়েয বন্ধ হলে গোসল করা আবশ্যক।

৪. নিফাস বন্ধ হলেও গোসল করা আবশ্যক হয়।

জুম'আ ও দুই ঈদের জন্য গোসল করা সুন্নাত।

গোসলের ধারাবাহিক বর্ণনা

প্রথমে মনে মনে নিয়্যত করে নেবে।

এরপর বিসমিল্লাহ পড়বে। উভয় হাত তিন বার করে ধৌত করবে, এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নেবে।

এরপর পূর্ণরূপে অযু করে নেবে।

এরপর মাথায় তিন বার পানি ঢালবে। চুলের গোড়ায় ভালভাবে পানি পৌঁছাবে।

এরপর পুরো দেহে পানি ঢালবে। দু’ হাত দিয়ে দেহ মলবে, যেন দেহে ভালভাবে পানি পৌঁছয়।

চুলের গোড়া, বা দেহের যেসব অঙ্গে পানি সহজে পৌঁছয় না, যেমন বগলের নীচে, গলার নীচে, নাভীর ভিতর, হাঁটুর ভাঁজ ইত্যাদিতে, সেগুলোয় যত্নসহকারে পানি পৌঁছানো জরুরি। ঘড়ি বা আংটি পরিধান করা থাকলে ভালভাবে নেড়েচেড়ে সেগুলোর নীচে পানি পৌঁছাবে।

তায়াম্মুমের আহকাম

তায়াম্মুম বলতে, পানি ব্যবহারে সমর্থ না হলে অপবিত্রতা দূর করার জন্য মাটি ব্যবহার করাকে বোঝায়।

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য উঠ ... আর পানি না পাও, তা হলে পবিত্র মাটির ইচ্ছা করো, তা দিয়ে তোমাদের মুখমল ও তোমাদের হাত মাসেহ করো। [সূরা মায়েদা : ৬]

তায়াম্মুম হল, পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করে নেওয়া।

অযু করলে যেসব কাজ বৈধ হয়, যেমন সালাত, তাওয়াফ, কুরআন পাঠ ইত্যাদি, তায়াম্মুম করলেও সেসব কাজ বৈধ হয়।

চার অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয

১. পানি না থাকলে, চাই সফররত অবস্থায় হোক, কিংবা মুকিম থাকা অবস্থায়। তবে পানি পাওয়ার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হলেই কেবল তায়াম্মুম করা যাবে।

২. যদি সাথে পানি থাকে, কিন্তু তা অযুর জন্য যথেষ্ট না হয়, এবং পান করা ও রান্নাবান্নার জন্য পানির প্রয়োজন হয়।

৩. যদি রোগের কারণে পানি ব্যবহারে অসমর্থ হয় কিংবা শরীরের কোন অংশ পুড়ে যাওয়ার কারণে পানি ব্যবহারে অসমর্থ হয়।

৪. যদি পানি থেকে থাকে, কিন্তু তা সংগ্রহের শক্তি না থাকে, তা হলেও তায়াম্মুম করা যাবে। যেমন পানি অনেক দূর, যেখানে গিয়ে পানি এনে অযু করতে করতেই সালাতের সময় পেরিয়ে যাবে;[৪] অথবা পানি পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা বিপদসংকুল, কিংবা পানি ক্রয় করতে হবে এবং ক্রয়মূল্য অনেক বেশি–এসব ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা জায়েয।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সময়, যখন তা গরম করার ব্যবস্থা না থাকে, সে-ক্ষেত্রেও তায়াম্মুম করা যাবে।

মাটি বা মাটি-জাতীয় যা-কিছু আছে, সেসব দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে। যেমন মাটি, বালি, পাথর ইত্যাদি। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। [সূরা মায়েদা : ৬]

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে ফাঁক রেখে মাটিতে আঘাত করবে। এরপর তা দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করে নেবে। আবার মাটিতে আঘাত করে এক হাত দিয়ে অপর হাত মাসেহ করবে। আঙ্গুলের পেট দিয়ে আঙ্গুলের পিঠ মাসেহ করবে।

কেউ যদি পানি ব্যবহারেও অক্ষম হয় এবং তায়াম্মুমও করতে না পারে, তা যে কোনো কারণেই হোক, (যেমন, কেউ উড়োজাহাজে আছে, এবং সেখানে অযু করার মত পর্যাপ্ত পানিও নেই, এবং মাটিও নেই যে, তায়াম্মুম করবে;) আর ওয়াক্তও পেরিয়ে যাচ্ছে, তা হলে এ অবস্থায়ই, অযু ও তায়াম্মুম ছাড়া সালাত পড়ে নেবে। সামর্থ্যের বাইরে আল্লাহ ﷻ বান্দাকে কোনো কাজের আদেশ করেন না।

---

৪. এখানে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে।

আল্লাহই রক্ষাকারী

ইমাম বুখারি ﷺ-র বর্ণনা। ইবরাহিম ﷺ সফর করছিলেন। সাথে ছিলেন তার স্ত্রী সারা। তারা দুজন একটি শহরে প্রবেশ করলেন। সেখানকার বাদশাহ ছিল এক স্বেচ্ছাচারী শাসক।

তার এক অনুচর এসে তাকে জানাল, এখানে এক ব্যক্তি এসেছে। তার সাথে এক নারী আছে, খুবই সুন্দরী। ওকে শুধু আপনার সাথেই মানায়।

ইবরাহিম ﷺ-র নিকট ওই অত্যাচারী শাসক তার বাহিনী পাঠাল। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সাথে যে নারী আছে, সে কে?' ইবরাহিম ﷺ বুঝতে পারলেন, এই অত্যাচারীর মুকাবেলা করার শক্তি তার নেই। তিনি যদি বলেন, 'এ হল আমার স্ত্রী' তা হলে তারা তাকে মেরে ফেলবে। তাই তিনি তাদের বললেন, 'এ হল আমার বোন।'

এরপর তিনি স্ত্রী সারার নিকট এলেন; বললেন, 'সারা! দুনিয়ার বুকে তুমি আর আমি ছাড়া মুমিন বলতে কেউ নেই। এই ব্যক্তি তোমার সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে। তাকে বলেছি, তুমি আমার বোন। তাই তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বানিয়ো না।'

অত্যাচারী শাসক সারার নিকট লোক পাঠাল। তাকে তার নিকট উপস্থিত করা হল। সে তার কক্ষে এল। তার নিকট এগোল। এরপর যখন তার দিকে হাত বাড়াল, তার হাত অবশ হয়ে গেল। এতে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। বলল, 'তুমি আল্লাহর নিকট দোয়া করো, তিনি যেন আমাকে সুস্থ করে দেন। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।'

সারা তার জন্য দোয়া করলেন। তার হাতে আবার অনুভূতি ফিরে এল। শয়তান তাকে প্ররোচনা দিল। সে আবার তার দিকে অগ্রসর হল। তিনি তার জন্য বদদোয়া করলেন। এতে তার হাত আবার আগের মত, বরং আগের চেয়েও বেশি অসাড় হয়ে গেল। সে যখন বুঝতে পারল, এই নারীর ওপর তার শক্তি চলবে না, সে ভীত হয়ে পড়ল; বলল, ' তুমি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করো। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।'

সারা তার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ ﷻ তার হাত সুস্থ করে দিলেন। হাতে আবার অনুভূতি ফিরে এল।

সে তার এক দারোয়ানকে ডেকে পাঠাল। তাকে বলল, ' তোমরা আমার নিকট কোনো মানুষ আনোনি, এনেছ এক শয়তান।' এরপর তাকে তার প্রাসাদ থেকে বের করে দিল। তাকে একটি দাসীও দিল। তার নাম হাজেরা।

সেখান থেকে বেরিয়ে সারা তার স্বামীর নিকট গেলেন। ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলেন, তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আল্লাহ ﷻ-র নিকট দোয়া করছেন, কান্নাকাটি করছেন।

সারা ফিরে এসেছেন বুঝতে পেরে তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন, তার সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি বললেন, ' আল্লাহ ﷻ ওই বদমাশের চক্রান্তে তাকেই ফাঁসিয়ে দিয়েছেন।'

দেখো! বিপদের সময় ইবরাহিম عليه السلام কীভাবে তার প্রভুর দরবারে লুটিয়ে পড়লেন।

সালাতের আহকাম

সালাত ইসলামের একটি রুকন, দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। সব রাসুলের শরিয়তেই সালাতের হুকুম ছিল।

আল্লাহ ﷻ-র নিকট সালাতের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে মে'রাজের রাতে নবীজি ﷺ-এর ওপর সালাত ফরজ করেছেন, পবিত্র কুরআনের ৫৮ জায়গায় সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাকে সালাতের নির্দেশ দেবে, যেন সে এর গুরুত্ব বোঝে এবং তা আদায়ে অভ্যস্ত হয়।

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদের সালাতের নির্দেশ দাও। আর দশ বছর হলে সালাতের জন্য প্রহার করো এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও। [তিরমিযি, মুসনাদে আহমাদ]

সালাতকে সময় থেকে বিলম্বিত করা জায়েয নেই। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا﴾

নিশ্চয় সালাত মুসলমানদের ওপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরজ। [সূরা নিসা : ১০৩]

তুচ্ছ জ্ঞান করে কেউ যদি সালাত না পড়ে, কিংবা কেউ যদি সালাত ফরজ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে, তা হলে সে কাফের হয়ে যাবে। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَوةِ

ব্যক্তি ও কুফরের মধ্যে রয়েছে সালাত ত্যাগ। [সহিহ মুসলিম]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন–

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

আমাদের আর তাদের মধ্যকার পার্থক্য হল সালাত। কাজেই যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল, সে কুফরি করল। [মুসনাদে আহমাদ]

সালাত পড়ার পদ্ধতি

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, সেভাবেই তোমরা সালাত পড়ো। [সহিহ ইবনে হিব্বান, দারা কুতনি]

যেখানে ছবি রয়েছে, সেখানে সালাত পড়া মাকরূহ। কারণ, এতে মূর্তিপূজকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়।

একাকী সালাত পড়লে কিংবা ইমাম হলে সামনে সুতরা রাখা সুন্নাত। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا

তোমাদের কেউ সালাত পড়লে সুতরার দিকে ফিরে সালাত পড়বে, এবং সুতরার কাছাকাছি থাকবে। [সুনান আবু দাউদ]

সুতরা থাকলে সালাত আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে কেউ যেতে চাইলে বাধাপ্রাপ্ত হবে। আর সুতরার আড়ালে যা আছে, তার দিকে সালাত আদায়কারীর মনোযোগ যাবে না।

আর যদি মাঠে-ময়দানে থাকে, তা হলে সামনে গাছ রেখে, পাথর রেখে কিংবা লাঠি রেখে সালাত পড়বে। যে বস্তুর কারণে সালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, সালাত আদায়কারীর জন্য তা প্রতিহত করা জায়েয আছে। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّ فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

তোমাদের কেউ সালাত পড়লে, সামনে দিয়ে কাউকে যেতে দেবে না। সে যদি বাধা না মানে, তা হলে তার সাথে বিবাদ করবে। কারণ, তার সাথে তার [ফেরেশতা] সঙ্গী আছে। [সহিহ মুসলিম]

সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রথমে ক্বিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। এরপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করবে। তাকবির ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। আর তা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। তবে উঁচু আওয়াজে উচ্চারণের শর্ত নেই। আর মূক [বাকশক্তিহীন] মনে মনে উচ্চারণ করবে।

তাকবির বলার সময় উভয় হাত কাঁধ অথবা কান বরাবর উঠানো সুন্নাত।

এরপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলি দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে। আর সেজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি রাখবে।

এরপর দোয়া পড়বে। এই দোয়া পড়া সুন্নাত–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

এই দোয়াও পড়া যেতে পারে–

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ

এরপর বলবে–

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আবার এই দোয়াও পড়া যেতে পারে–

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

এরপর বলবে–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এরপর প্রত্যেক রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে। এটা সালাতের রুকন। এটি ছাড়া সালাত হবে না।

সালাত আদায়কারী যদি সূরায়ে ফাতিহা পড়তে না পারে, তা হলে তার পরিবর্তে কুরআন থেকে যা পারে, পড়বে। আর যদি এটাও না পারে [যেমন নওমুসলিম], তা হলে কুরআনের পরিবর্তে তসবিহ পাঠ করবে–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

আর খুব তাড়াতাড়ি সূরায়ে ফাতিহা শিখে নেবে।

সূরায়ে ফাতিহার পর কুরআনের অন্যখান থেকে যা পারা যায়, পড়বে।

সালাত আদায়কারী কোনো কিছুর সম্মুখীন হলে, যেমন কেউ আসার অনুমতি চাইলে, ইমাম ভুল করলে, বা কারও ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে [পুরুষ] তসবিহ পড়ে এবং [মহিলা] করতালি দিয়ে সতর্ক করতে পারবে। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ

> সালাতে হঠাৎ কিছুর সম্মুখীন হলে তোমাদের পুরুষরা তসবিহ পড়বে এবং মহিলারা করতালি দেবে। [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

সালাত আদায়কারীকে কেউ সালাম দিলে শুধু হাত দ্বারা ইশারা করে সালামের উত্তর দিবে।

সালাতের কিয়ামে যেসব ভুল হয়

১. অনেকে সালাতে এভাবে নিয়্যত করে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে অমুক ওয়াক্তের অত রাকআত অমুক সালাত পড়ছি। এটা জরুরি মনে মুখে উচ্চারণ করা বেদআত। বরং নিয়্যত মনে মনেই করবে। এবং যে সালাত পড়ছে, মনের মধ্যে সেটা উপস্থিত রাখবে। যদি মুখে মুখেই নিয়্যত করে, কিন্তু মনের মধ্যে সেটা উপস্থিত না থাকে, তা হলে নিয়্যত হবে না। ফলে সালাতও হবে না।

২. ইমাম সাহেব যখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [আমরা তোমারই ইবাদত করি, এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই।] পড়েন, তখন অনেকেই বলে, اِسْتَعَنَّا بِاللهِ [আমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।]। এটা ভুল।

৩. رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ এর পর অনেকে وَ لَكَ الشُّكْرُ যোগ করে। এটাও ভুল।

৪. রুকু' থেকে ওঠার পর রফ' য়ে ইয়াদাইন করে মুখ মাসেহ করা।

৫. কাতার সোজা না করা এবং সালাত আদায়কারীদের মধ্যে ফাঁক রাখা।

৬. সালাতে এদিক-সেদিক তাকানো বা ওপরের দিকে মুখ তোলা। শরিয়তের বিধান হল, সেজদার জায়গার দিকে তাকানো।

৭. পেশাব-পায়খানার প্রচণ্ড বেগ হলেও তা চেপে রেখে সালাত পড়া।

৮. বিনা প্রয়োজনে মুখ ঢেকে রাখা কিংবা দু' দিকে দু' হাত ঝুলিয়ে দেওয়া।

৯. বাম হাতের ওপর ডান হাত দিয়ে তা পেটের ওপর রাখা।[৫] সুন্নাত হল বুকের ওপর রাখা।

১০. বিনা প্রয়োজনে চোখ বন্ধ রাখা।

১১. এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে জট পাকানো, বা আঙ্গুল ফোটানো।

এরপর আল্লাহু আকবার বলে রুকু' তে যাবে, এবং কাঁধ বরাবর বা কান বরাবর হাত উঠাবে,[৬] যেমনটা তাকবিরে তাহরিমার সময় করা হয়েছে।

রুকু'র মধ্যে পিঠ সোজা রাখবে। হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক রেখে হাঁটু ধরবে। আর রুকু' তে এই তসবিহ পাঠ করবে– سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ। এক বার বলা ওয়াজিব । এক বারের অধিক বলা সুন্নাত।

আর রুকুর মধ্যে এটাও বলা সুন্নাত–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

আরও বলবে–

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

এরপর سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه বলে মাথা তুলে দাঁড়াবে। এখানেও তাকবিরে তাহরিমার মত হাত ওঠানো সুন্নাত।[৭] রুকু' হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলবে– اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ। অথবা বলবে– رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ। এরপর এটা পড়া সুন্নাত–

مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

---

[৫] হানাফী আলেমদের মতে, পেটের ওপর হাত রাখা ভুল নয়।

[৬] হানাফী আলেমদের মতে রুকুর সময় হাত উঠাবে না। হাত না ওঠানোর আমলও রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

[৭] এখানেও হাত না ওঠানোর আমল রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

এ সময় বুকের ওপর হাত রাখা সুন্নাত,[৮] যেমনটা রুকু'র আগে কিয়ামে ছিল।

রুকু'তে যেসব ভুল হয়

১. রুকু'র সময় মেরুদণ্ড সোজা না রাখা। এ সময় পিঠ সোজা রাখা সুন্নাত।

২. দু' পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখা। সুন্নাত হল সেজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি রাখা।

৩. পিঠের সাথে মাথা সমান্তরাল না হওয়া। সুন্নাত হল, মাথা পিঠের সমান্তরালে থাকা।

এরপর আল্লাহু আকবার বলে সেজদায় যাবে। আর সেজদার মধ্যে এই তসবিহ পড়বে–

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

একবারের অধিক যা পড়া হবে, তা হবে সুন্নাত।

সাতটি অঙ্গ দ্বারা সেজদা হবে– দু' পা, দু' হাঁটু, দু' হাত এবং নাক ও কপাল। এ সময় সেগুলোর কোনোটাই মাটি থেকে ওঠাবে না। কোনো উজরের কারণে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি যদি সেজদা করতে অক্ষম হয়, তা হলে যতটুকু সম্ভব মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারায় সেজদা করবে।

---

[৮] হানাফী আলেমদের মতে, এ সময় হাত বাঁধবে না, বরং ছেড়ে দিয়ে রাখবে।

সেজদার মধ্যে উরু হতে পেট দূরে রাখবে, এবং পাঁজর হতে বাহু দূরে রাখবে। এটা সুন্নাত।

সেজদার মধ্যে বেশি বেশি দোয়া করবে। এ সময় বান্দা তার প্রভুর খুব নিকটবর্তী থাকে।

সেজদায় যেসব ভুল হয়

১. সাতটি অঙ্গ দ্বারা সেজদা না করা।

২. সেজদার সময় হাতের কনুই বা পায়ের গোড়ালি মাটিতে রাখা।

৩. নাক না লাগিয়ে শুধু কপাল দ্বারা সেজদা করা।

৪. সেজদার সময় মাটি থেকে পা উঠিয়ে ফেলা কিংবা মাটির ওপর শুধু আঙ্গুলের মাথা রাখা। আঙ্গুলের পেট মাটিতে মিলিয়ে রাখা ওয়াজিব।[৯]

৫. উরুর সাথে পেট চেপে রাখা বা পাঁজরের সাথে বাজু মিলিয়ে রাখা। নিয়ম হল, এগুলো দূরে দূরে রাখা।

এরপর আল্লাহু আকবার বলে মাথা ওঠাবে। উভয় সেজদার মাঝখানে বসবে। বসার নিয়ম হল, বাম পা বিছিয়ে সেটার ওপর বসবে, এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখবে। আর হাতদুটো দু' উরুর ওপর এমনভাবে রাখবে, যেন হাতের আঙ্গুলগুলো হাঁটুর নিকট থাকে। অথবা ডান হাত ডান হাঁটুর ওপর এবং বাম হাত বাম হাঁটুর ওপর রাখবে।

দু' সেজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় এই দোয়া পড়তে হবে–

---

[৯] হানাফী আলেমদের মতে এটা সুন্নাত।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ ارْحَمْنِيْ وَ اهْدِنِيْ وَ অথবা اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ অথবা رَبِّ اغْفِرْ لِيْ
عَافِنِيْ وَ ارْزُقْنِيْ

এগুলোর একটি এক বার বলা ওয়াজিব।[১০] একের অধিক সুন্নাত।

এরপর দ্বিতীয় সেজদা করবে। দ্বিতীয় সেজদা শেষ করে আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠে দাঁড়াবে। আর যদি দ্বিতীয় সেজদা হতে দাঁড়ানোর সময় একটুখানি বসে, তা হলেও সালাত হবে। এটাকে জলসায়ে ইসতিরাহাত বলে।

এরপর প্রথম রাকআতের মত দ্বিতীয় রাকআত পড়বে। তবে তাকবিরে তাহরিমার পর যে দোয়া পড়া হয়, তা পড়বে না। তদ্রূপ সূরায়ে ফাতিহার আগে أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়বে না। কারণ, প্রথম রাকআতের শুরুতে তা পড়া হয়েছে।

দ্বিতীয় সেজদার পর তাশাহহুদের জন্য পা বিছিয়ে বসবে। আর কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল গুটিয়ে নেবে। বৃদ্ধা ও মধ্যমা দ্বারা গোলাকার হালকা বানিয়ে তর্জনী দ্বারা ইশারা করবে। অথবা ডান হাতের সবগুলো আঙ্গুল গুটিয়ে নিয়ে তর্জনী দিয়ে ইশারা করবে। আর বাম হাত দিয়ে বাম হাঁটু ধরবে। চাইলে হাঁটু না ধরে উরুর ওপর আঙ্গুলগুলো মেলে রাখতে পারে। তাশাহহুদে এই দোয়া পড়বে–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّااللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ.

সালাত যদি দু' রাকআতবিশিষ্ট হয়, যেমন ফজরের সালাত, তা হলে এই বৈঠকই হবে শেষ বৈঠক। সে-ক্ষেত্রে তাশাহহুদ শেষ করার পর এই দোয়া পড়বে–

---

[১০] হানাফী আলেমদের মতে এই দোয়াগুলো পড়া ওয়াজিব নয়। পড়তে চাইলে পড়তে পারে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

আর যদি সালাত তিন রাকআতবিশিষ্ট, যেমন মাগরিবের সালাত, বা চার রাকআতবিশিষ্ট হয়, যেমন যোহর, আসর ও ইশা, তা হলে তাশহুদ পড়ার পর আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। এ সময় তাকবিরে তাহরিমার মত হাত ওঠাবে।[১১] এরপর আগের মত বুকের ওপর হাত বাঁধবে।[১২] আর তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে শুধু সূরায়ে ফাতিহা পড়বে।

এরপর শেষ বৈঠকে বসবে। এখানে নিতম্বের ওপর ভর করে বসবে। তা এভাবে, বাম পা ডান পায়ের গোছার নীচে রাখবে। আর নিতম্বের কিছুটা মাটির ওপর রাখবে। আর বাম হাত হাঁটুর ওপর ভর করে রাখবে । এরপর পুরো তাশাহহুদ পড়ে দরূদ শরিফ পড়বে। এরপর দোয়ায়ে মাছুরা পড়বে। এটি পড়া সুন্নাত। দোয়াটি হল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَ ارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

আবার এ দোয়াও পড়া যায়–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

এরপর যে-কোনো দোয়া করা যায়। যেমন–

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ

এরপর ডান দিকে সালাম ফেরাবে। সালামের শব্দ হল–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ

এরপর একইভাবে বাম দিকে সালাম ফেরাবে।

সালাতের পর কিছু যিকির-আযকার আছে, সেগুলো পড়বে–

---

১১. হানাফী আলেমদের মতে হাত ওঠাবে না।

১২. হানাফী আলেমদের মতে পেটে হাত বাঁধবে।

তিন বার ইসতেগফার পড়বে। এরপর বলবে–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَ لَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَ لَهُ الْفَضْلُ وَ لَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

এরপর سُبْحَانَ اللّٰهِ , اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ও اَللّٰهُ أَكْبَرُ এ তসবিহগুলোর প্রত্যেকটি তেত্রিশ বার করে পড়বে। এরপর এ দোয়াটি পড়ে শত বার পূর্ণ করবে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

এরপর আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে। আয়াতুল কুরসি হল–

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

এরপর সূরায়ে ইখলাস, সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস এক বার করে পাঠ করবে। তবে ফজর ও মাগরিবের সালাতের পর তিন বার করে পাঠ করা মুস্তাহাব। তদ্রূপ এই দু' ওয়াক্ত সালাতের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি দশ বার করে পড়া মুস্তাহাব–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

সালাত পড়েছ!
না, তুমি তো সালাত পড়োনি!

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা। একদিনের ঘটনা। নবীজি ﷺ তার সাহাবিদের নিয়ে মসজিদে বসে আছেন। এ সময় একব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করল। প্রবেশ করেই সে সালাত পড়া শুরু করল। সে সালাত পড়ছিল, আর নবীজি ﷺ তার সালাত দেখছিলেন। সালাত শেষ করে সে নবীজি ﷺ-র নিকট এল। সালাম করল। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। এরপর বললেন, 'ফিরে গিয়ে সালাত পড়ো। তুমি সালাত [সঠিকভাবে] পড়নি।' লোকটি ফিরে গেল। সালাত পড়ল। আগের মতই পড়ল। এরপর নবীজি ﷺ-র নিকট এসে সালাম করল। তিনি বললেন, 'ওয়া আলাইকাস্‌সালাম! ফিরে গিয়ে সালাত পড়ো। কারণ, তুমি সালাত [সঠিকভাবে] পড়নি।' তখন লোকটি বলল, 'যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার শপথ! এর থেকে ভালভাবে আমি পড়তে পারি না। আমাকে শিখিয়ে দিন!'

তখন নবীজি ﷺ বললেন, 'তুমি যখন সালাতে দাঁড়াবে, তখন তাকবির বলবে। এরপর কুরআন থেকে যতটুকু পার, পড়বে। এরপর রুকু' করবে। রুকু'তে গিয়ে স্থির হবে। এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর সেজদা করবে। সেজদায় গিয়ে স্থির হবে। এরপর স্থির হয়ে বসবে। এভাবেই পুরো সালাত শেষ করবে।'

'ফিরে গিয়ে সালাত পড়ো। কারণ, তুমি সঠিকভাবে সালাত পড়নি।' –সালাতশেষে এ কথা বলার মানুষ যে কত মুখাপেক্ষী!

আজকাল মানুষ সেজদার সময় মাটিতে মাথা ঠেকিয়েই উঠিয়ে ফেলে, যেন কাকের ঠোকর। রুকু' থেকেও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, যেন সন্দেহ নিয়ে সালাত পড়ছে। সেজদায় আল্লাহ ﷻ-র নিকট কান্নাকাটি তো নেই-ই। দয়াময় আল্লাহ ﷻ-র সামনে বিনয় প্রকাশও নেই।

রুগ্ন ব্যক্তির সালাত

পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে রুগ্ন ব্যক্তি কয়েকটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে:

১. তার রোগ যদি সাধারণ হয় যে, পানি ব্যবহারে তার কোনো ক্ষতি হবে না, যেমন মাথা ব্যথা, দাঁত ব্যথা ইত্যাদি, তা হলে তার জন্য পানি ব্যবহার করা ওয়াজিব। তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না।

২. যদি রোগ এ ধরনের হয় যে, পানি ব্যবহারে তা বৃদ্ধি পাবে, তা হলে তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয।

৩. যদি অক্ষমতার কারণে বা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কায় রুগ্ন ব্যক্তি অযু বা গোসল করতে সক্ষম না হয়, তা হলে সে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন—

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

আর তোমরা যদি রোগাক্রান্ত হও, বা সফরে থাক, বা তোমাদের কেউ নিম্নভূমি [পায়খানা] থেকে আসে, বা নারীদের সাথে সঙ্গম কর, আর পানি না পাও, তা হলে তায়াম্মুম করো। [সূরা মায়েদা : আয়াত : ৬]

নিজে তায়াম্মুম করতে না পারলে অন্য ব্যক্তি তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দেবে। তা এভাবে যে, রুগ্ন ব্যক্তির উভয় হাত ধরে তা মাটির ওপর আঘাত করবে। এরপর তার মুখমণ্ডল মাসেহ করিয়ে দেবে। একইভাবে তার উভয় হাতও মাসেহ করিয়ে দেবে।

তার দেহ, পোশাক বা বিছানা যদি নাপাক থাকে, এবং তা দূর করতে বা পবিত্র করতে সে সক্ষম না হয়, তা হলে এ অবস্থায়ই সে সালাত পড়ে নেবে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

তোমরা আল্লাহকে যতটুকু সম্ভব, ভয় করো। [সূরা তাগাবুন : আয়াত : ১৬]

৪. কারও দেহে যদি ক্ষত থাকে, বা দেহের চামড়া ফেটে গিয়ে থাকে, কিংবা কোনো অঙ্গ ভেঙ্গে গিয়ে থাকে বা দেহে কোনো রোগ থাকে, পানি ব্যবহার যার জন্য ক্ষতিকর, আর তার জন্য গোসল ফরজ হয়, তবে সে তায়াম্মুম করতে পারবে। এর প্রমাণ হল পূর্বোক্ত দলিল। যদি দেহের সুস্থ অংশ ধোয়া সম্ভব হয়, তা হলে তা-ই করবে এবং বাকিটার জন্য তায়াম্মুম করবে।

৫. যদি রুগ্ন ব্যক্তি এমন জায়গায় থাকে, যেখানে পানিও নেই, মাটিও নেই, বা সেগুলো সংগ্রহ করে দেওয়ার মত কেউ নেই, তা হলে সে মনে মনে পবিত্রতার নিয়্যত করে নেবে, এবং এ অবস্থায়ই সালাত পড়ে নেবে। সালাত বিলম্ব করা জায়েয হবে না। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

তোমরা আল্লাহকে যতটুকু সম্ভব, ভয় করো। [সূরা তাগাবুন : আয়াত : ১৬]

৬. যার সব সময় পেশাব বা রক্ত ঝরতে থাকে, কিংবা পায়ুপথে বায়ু বের হতে থাকে, এবং চিকিৎসা দ্বারা তা সুস্থ হয়নি, সে প্রত্যেক ওয়াক্তে অযু করবে। আর দেহে বা পোশাকে যে নাপাকি লেগেছে, তা ধুয়ে নেবে কিংবা সম্ভব হলে সালাতের জন্য পবিত্র পোশাকের

ব্যবস্থা রাখবে। সম্ভব হলে, নাপাকি বের হওয়ার স্থানে তুলা বা এ ধরনের কিছু দিয়ে রাখবে, যেন পোশাকে বা দেহের অন্যত্র নাপাকি না পৌঁছয়। এটা করতে পারলে ভাল। সালাতশেষে তা খুলে ফেলবে।

৭. রুগ্ন ব্যক্তির দেহের কোথাও পট্টি বা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকলে অযু বা গোসলের সময় সেটার ওপর মাসেহ করবে এবং বাকি অঙ্গ ধুয়ে নেবে। যদি সেটার ওপর বা বাকি দেহে মাসেহ করা বা পানি পৌঁছানো ক্ষতিকর হয়, কিংবা দেহে এমন ফাটল থাকে যে, তা ধোয়া বা মাসেহ করা সম্ভব নয়, [যেমন পোড়া ঘা] তা হলে শুধুই তায়াম্মুম করে নেবে।

রুগ্ন ব্যক্তির সালাতের পদ্ধতি

এ বিষয়ে সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে সক্ষম নয়, সে বসে বসে সালাত পড়বে। আর সে তার সুবিধামতই বসবে। তাই এখানে বসার কোনো নির্দিষ্ট সুরত নেই।

আর যদি বসে পড়তেও সক্ষম না হয়, তা হলে কাত হয়ে ক্বিবলার দিকে ফিরে সালাত পড়বে। মুস্তাহাব হল ডান দিকে কাত হয়ে সালাত পড়া। যদি কাত হয়ে পড়তে অসুবিধে হয়, তা হলে পিঠের ওপর ভর করে পড়বে। আর সম্ভব হলে, পা-দুটি ক্বিবলার দিকে রাখবে।

নবীজি ﷺ ইমরান বিন হুসাইন রাযি.কে বলেছিলেন–

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

দাঁড়িয়ে সালাত পড়ো। এর শক্তি না থাকলে বসে সালাত পড়ো। আর এরও যদি শক্তি না থাকে, তা হলে একপাশে ফিরে। [সহিহ বুখারী]

নাসাঈর বর্ণনায় আরও আছে—

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا

এটাও যদি না পার, তা হলে চিৎ হয়ে।

আর যে ব্যক্তি দাঁড়াতে পারে, কিন্তু রুকু'- সেজদা করতে পারে না, তার থেকে কিয়ামের হুকুম রহিত হবে না। তাকে দাঁড়িয়েই সালাত আদায় করতে হবে। আর রুকু' করবে ইশারায়। [অর্থাৎ মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করবে।] আর সেজদার সময় বসে যাবে [চেয়ারের ওপর হলেও]। এবং ইশারায় সেজদা করবে। কারণ, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন—

﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

তোমরা আল্লাহর জন্য অনুগত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। [সূরা বাকারা : আয়াত : ২৩৮]

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন—

صَلِّ قَائِمًا

দাঁড়িয়ে সালাত পড়ো। [সহিহ বুখারি]

যদি রোগের প্রচণ্ডতার কারণে বা অনুভূতিহীনতার কারণে মাথা দিয়ে ইশারাও করতে না পারে , তা হলে মনে মনে রুকু' সেজদার নিয়্যত করবে।

যদি সে নিজে নিজে ক্বিবলার দিকে ফিরতে সক্ষম না হয়, আর তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার মতও কেউ না থাকে, তা হলে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায়ই সালাত পড়বে, তা যে দিকে ফিরেই হোক।

কিছু কিছু লোক সব সময়ে রোগে ভোগে। পূর্ণরূপে সালাত পড়ার সুযোগ তাদের হয় না। হয়ত তারা অযু করতে পারে না, বা সব সময় দেহ নাপাক থাকে। ফলে তারা সালাত ছেড়ে দেয়। এটা বিরাট ভুল। এদের জন্য সালাত ছেড়ে দেওয়া জায়েয নেই। বরং যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায়ই সালাত পড়ে নেবে। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

তোমরা আল্লাহকে যতটুকু সম্ভব, ভয় করো। [সূরা তাগাবুন : আয়াত : ১৬]

কোনো কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বলে, সুস্থ হলে বাদ দেওয়া সালাতগুলো পড়ে নেব। এটা ঢিলেমি। বরং যেভাবে সম্ভব, ওয়াক্তমত সালাত পড়ে নেবে। ওয়াক্ত থেকে সালাত বিলম্বিত করা জায়েয নেই।

কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বা সুস্থ ব্যক্তি যদি সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকে, বা ওয়াক্তমত সালাত পড়তে ভুলে যায়, ঘুম থেকে ওঠার পর, বা সালাতের কথা স্মরণ হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ পড়ে নেবে, ওইরকম আরেক ওয়াক্তের আসার অপেক্ষা করবে না। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا ، فَلْيُصَلِّهَا مَتَى ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَالِكَ

কেউ যদি সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকে, বা সালাত পড়তে ভুলে যায়, তা হলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা পড়ে নেবে। এর কাফ্‌ফারা এটাই। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

যদি প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতে তার জন্য সালাতের সব আয়োজন করা কঠিন হয়, তা হলে দু' ওয়াক্ত একসাথে পড়বে। যেমন যোহর-আসর একসাথে পড়বে, এবং মাগরিব-ইশা একসাথে পড়বে। একত্রে পড়ার ক্ষেত্রে জম'য়ে তাকদিমও [আগের ওয়াক্তে পরের ওয়াক্তসহ পড়ে নেওয়া] করা যেতে পারে; আর জম'য়ে তাখিরও [পরের ওয়াক্তে আগের ওয়াক্তসহ পড়ে নেওয়া] করা যেতে পারে। চাইলে আসরকে আগে নিয়ে যোহরের সময় পড়ে নেবে; আর চাইলে যোহরকে দেরি করে আসরের সময় পড়ে নেবে। মাগরিব ও ইশার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ।[১৩] তবে ফজরের সালাত ওয়াক্তমত পড়ে নেবে।

---

১৩. হানাফী আলেমদের মতে এরকম করার কোনো সুযোগ নেই। প্রতিটি সালাত তার ওয়াক্তমত আদায় করতে হবে।

সালাতের শর্ত

সালাতের কিছু শর্ত আছে, যেগুলো পূর্ণরূপে পাওয়া না গেলে সালাত শুদ্ধ হবে না। যথা–

১. সালাতের আগে পবিত্রতা অর্জন করা, অযু দ্বারা হোক, বা তায়াম্মুম দ্বারা হোক। কেউ যদি এর কোনোটাই করতে সমর্থ না হয়, তা হলে যেভাবে পারে, সালাত পড়ে নেবে। সালাত বাদ দেওয়া যাবে না।

২. সালাতের ওয়াক্ত হওয়া। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا﴾

নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে। [সূরা নিসা : আয়াত : ১০৩]

ওয়াক্তগুলো হল–

যোহরের ওয়াক্ত

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর এই সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়। প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার আসল ছায়া [ঠিক দ্বিপ্রহরে যে পরিমাণ ছায়া হয়,] ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এই সালাতের ওয়াক্ত থাকে।

আসরের ওয়াক্ত

যোহরের ওয়াক্তের পর থেকে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই সালাতের ওয়াক্ত থাকে। তবে এই সালাত আওয়াল ওয়াক্তে আগেভাগে পড়ে নেওয়া সুন্নত।

মাগরিবের ওয়াক্ত

সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু। আর পশ্চিমাকাশের সাদা রং দূর হয়ে কালো হওয়া পর্যন্ত সালাতের ওয়াক্ত থাকে।

ইশার ওয়াক্ত

মাগরিবের সালাতের পর থেকে এই সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর বাকি থাকে ফজরের আগ পর্যন্ত। তবে অর্ধেক রাতের আগেই পড়ে নেওয়া চাই।

ফজরের ওয়াক্ত

সুবহে সাদিক হলেই এই সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্যোদয় পর্যন্ত বাকি থাকে।

৩. সতর ঢাকা। সালাতের জন্য যতটুকু পারা যায়, নিজেকে পরিপাটি করে নেবে। তবে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অবশ্যই ঢেকে নিতে হবে। আর মহিলাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাতের তালু ব্যতীত পুরো দেহই ঢেকে নিতে হবে।

৪. নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন। দেহও নাপাকি থেকে মুক্ত থাকতে হবে, পরিধানের পোশাকও মুক্ত থাকতে হবে, এবং সালাতের জায়গাও পবিত্র হতে হবে।

সালাতের পর কেউ যদি তার দেহে নাপাকি দেখতে পায়, আর জানা না যায় যে, তা কখন দেহে লেগেছে, তা হলে তার সালাত শুদ্ধ বলে গণ্য হবে।

তদ্রূপ কেউ যদি সালাতের আগেই নাপাকি সম্বন্ধে জেনে থাকে, কিন্তু দূর করতে ভুলে যায়, এবং এভাবেই সালাত পড়ে নেয়, তা হলে তার সালাত শুদ্ধ হয়েছে বলে ধরা হবে।

আর যদি সালাতের মধ্যে নাপাকি সম্বন্ধে জানতে পারে, এবং তা সহজে দূর করা যায়, তা হলে তা-ই করবে। যেমন জুতায় বা
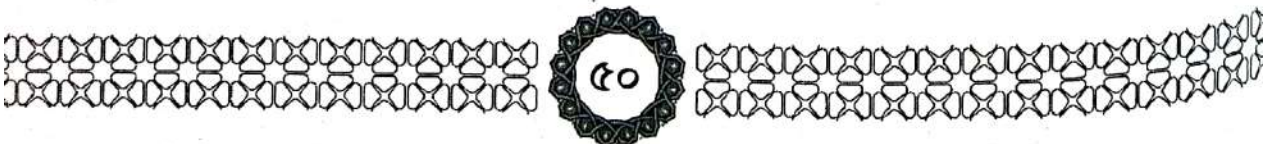
পাগড়িতে নাপাকি দেখলে তা খুলে ফেলা যায়। এবং এভাবেই সালাত শেষ করবে। আর যদি সালাতে থেকে দূর করা সম্ভব না হয়, তা হলে সালাত ছেড়ে দেবে এবং নাপাকি ধুয়ে নিয়ে পুনরায় সালাত পড়বে।

কবরস্তানে সালাত পড়া জায়েয নেই। তদ্রূপ কবরে বানানো মসজিদেও জায়েয নেই। মসজিদ যদি কবরের আগের হয়, তা হলে কবর উঠিয়ে ফেলবে। এবং মৃতকে স্থানান্তর করে নেবে। আর মসজিদ যদি কবরের পরের হয়, তা হলে মসজিদও সরানো যেতে পারে, আবার কবর সরিয়ে ফেললেও জায়েয হবে।

৫. সালাতের জন্য ক্বিবলামুখী হওয়া। তবে কেউ যদি ক্বিবলার দিকে ফিরতে অপারগ হয়, যেমন রুগ্ন ব্যক্তি বা বেঁধে রাখা ব্যক্তি, তা হলে যেদিকে সম্ভব, সেদিকে ফিরে সালাত পড়বে। আর যদি ক্বিবলার দিক জানা না থাকে, তা হলে কাউকে জিজ্ঞাসা করে সালাত পড়বে। জিজ্ঞাসা করার মত কাউকে না পেলে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে একদিকে ফিরে সালাত পড়বে। পরবর্তীতে যদি দেখা যায় যে, ক্বিবলা ভুল হয়েছে, তা হলেও তার সালাত হয়ে যাবে।

৬. নিয়্যত করা। নিয়্যতের জায়গা হল অন্তর। তাই উচ্চারণ করবে না।

সালাতের রুকন ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ

রুকন বলতে এমন বিষয় বোঝায়, যা ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যায়, চাই স্বেচ্ছায় ছাড়া হোক বা ভুলে।

আর ওয়াজিব বলতে এমন বিষয় বোঝায়, যা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে সালাত ফাসিদ হয়ে যায়, আর ভুলে ছুটে গেলে সালাত বাতিল হয় না, তবে সেজদায়ে সাহু দিয়ে সেটা সংশোধন করা যায়।

আর সুন্নাত বলতে এমন বিষয় বোঝায়, যা স্বেচ্ছায় বা ভুলে ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হবে না। তবে নবীজি ﷺ-র পূর্ণ সালাত ছিল রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নাতের সমন্বয়ে। তা ছাড়া তিনি বলেছেন–

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

> তোমরা সেভাবেই সালাত পড়ো, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখেছ। [ইবনে হিব্বান, দারা কুতুনি]

সালাতের রুকন

১. কিয়াম করা, তথা দাঁড়িয়ে সালাত পড়া।

২. তাকবিরে তাহরিমা অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা। [অবশ্যই মুখে উচ্চারণ করতে হবে।]

৩. সূরায়ে ফাতিহা পড়া। এটা ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর ওপর প্রত্যেক রাকআতেই ফরজ। আর মুক্তাদির ওপর সিররি সালাতের সব রাকআতে ফরজ, জেহরি সালাতের তৃতীয় ও চতুর্থ

রাকআতে ফরজ, আর প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে ওয়াজিব। আর জেহরি সালাতে ইমামের পড়ার পর মুক্তাদি পড়বে।[১৪]

৪. রুকু' করা।

৫. রুকু' হতে ওঠা।

৬. সেজদা করা।

৭. সেজদা হতে বসা।

৮. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

৯. শেষ তাশাহহুদে নবীজির ওপর সালাত পাঠ করা।

১০. প্রথম সালাম।

১১. রুকনগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

১২. উল্লিখিত কাজগুলোর প্রতিটি ধীরস্থিরভাবে আদায় করা।[১৫]

---

১৪. হানাফী আলেমদের মতে, সালাতের কোনো রাকআতেই সূরায়ে ফাতিহা পড়া ফরজ নয়, বরং ওয়াজিব। জেহরি ও সিররি সালাতের একই হুকুম। তা ছাড়া ইমামের পিছনে ইক্তিদাকারী অর্থাৎ মুক্তাদি সুরা না পড়ে চুপ থাকবে এবং ইমামের কেরাতের দিকে মনোযোগ রাখবে। তাঁদের মতে সিররি সালাতেও মুক্তাদি সূরায়ে ফাতিহা পড়বে না।

১৫. হানাফী আলেমদের মতে, এসব কাজের কোনো কোনোটি ফরজ, সবগুলো নয়। রুকু' করা ফরজ, কিন্তু রুকু' থেকে ওঠা ফরজ নয়, ওয়াজিব। সেজদা করা ফরজ, কিন্তু সেজদা থেকে উঠে বসা ফরজ নয়। তেমনিভাবে শেষ বৈঠকে অতটুকু সময়ের জন্য বসা ফরজ, যতটুকু সময়ে তাশাহহুদ পড়া যায়, কিন্তু তাশাহহুদ পড়া ফরজ নয়। তাশাহহুদের পর সালাত পাঠ করা সুন্নাত। প্রথম ও দ্বিতীয় কোনো সালামই ফরজ নয়। রুকনগুলোকে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ও ধীরস্থিরভাবে আদায় করাও ফরজ নয়।

সালাতের ওয়াজিব

১. এক রুকন হতে আরেক রুকনে যাওয়ার সময়ের তাকবিরগুলো বলা ওয়াজিব।[১৬] আর তাকবিরে তাহরিমা হল রুকন।

২. ইমাম ও মুনফারিদ [একাকী সালাত আদায়কারী]-এর জন্য سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه বলা। আর মুক্তাদির জন্য رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ বলা।

৩. তাহমিদ বলা। অর্থাৎ ইমাম, মুক্তাদি ও মুনফারিদের জন্য رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ বলা।

৪. রুকু' তে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলা।

৫. সেজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলা।

৬. দুই সেজদার মধ্যখানে رَبِّ اغْفِرْ لِيْ বলা।

৭. প্রথম তাশাহহুদ।[17] তা হল–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ.

৮. প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা।

এগুলো হল সালাতের ওয়াজিব। বুঝেশুনে কেউ যদি এগুলোর একটিও বাদ দিয়ে দেয়, তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, সে সালাত নিয়ে খেলছে। আর কেউ যদি অজ্ঞতাবশত বা ভুলে বাদ দেয়, সে সেজদায়ে সাহু করে নেবে।

---

১৬. হানাফী আলেমদের মতে এ সময়ে তাকবিরগুলো বলা সুন্নাত।

১৭. এই সাতটি আমলরে মধ্যে কবেল তাশাহহুদই হানাফী আলেমদের মতে ওয়াজবি। বাকগিুলো সুন্নাত।

অধীনস্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ

আব্দুল আজিজ বিন মারওয়ান তার পুত্র উমর ﵀-কে মদিনা পাঠালেন। তিনি সেখানে শিষ্টাচার শিখবেন, ইলম অর্জন করবেন। আর সালেহ বিন কাইসান ﵀-কে লিখে পাঠালেন, তিনি যেন তার খোঁজখবর রাখেন। সালেহ বিন কাইসান রহ. সালাতে সব সময় তার সাথে থাকতেন।

একদিন উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ সালাতে আসতে বিলম্ব করলেন। সালেহ বিন কাইসান ﵀ জিজ্ঞাসা করলেন, ' বিলম্বে আসার কারণ কী?'

তিনি বললেন, ' মাথা আঁচড়াচ্ছিলাম। তাই দেরি হয়ে গেছে।'

তিনি বললেন, ' চুলের প্রতি তোমার ভালবাসা এতটাই হয়ে গেছে যে, এর জন্য সালাতেও বিলম্ব করছ?'

বিষয়টি তার পিতার নিকট লিখে পাঠালেন। তার পিতা একজন দূত পাঠালেন। মাথার চুল কামানোর আগ পর্যন্ত তিনি তার সাথে কোনো কথাই বলেননি।

এক জুম'আয় আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান তার পুত্র হিশামকে দেখতে পেলেন না। সালাতের পর লোক পাঠিয়ে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

হিশাম বললেন, ' আমার খচ্চরটা আমাকে আনতে পারছিল না। অন্য কোনো প্রাণীও পাইনি।'

তিনি তার নিকট সংবাদ পাঠালেন, তুমি যখন পশু না থাকার কারণে জুম'আয় উপস্থিত হও না, আমিও কসম করেছি, পুরো এক বছর তোমাকে কোনো বাহন দেব না।

মুজাহিদ রহ. বলেন, ' আমি এক বদরি সাহাবিকে দেখেছি, তিনি তার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি কি আমাদের সাথে সালাত পড়েছ?'

তিনি বললেন, ' হ্যাঁ, পড়েছি।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ' তাকবিরে-উলা কি পেয়েছ?'

তিনি বললেন, ' না, পাইনি।'

সাহাবি বললেন, ' তুমি যখন কালো চোখবিশিষ্ট একশ' উট থেকেও উত্তম বস্তু হারালে ... ।'

আবু হুরায়রা ﵁ যখন সালাতের জন্য বেরতেন, তার পরিবারের লোকদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে তাদের ঘর থেকে বের করে মসজিদে নিয়ে যেতেন। আর এই আয়াত পাঠ করতেন–

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى﴾

তুমি তোমার পরিবারকে সালাতের নির্দেশ দাও; এবং এর ওপর ধৈর্যধারণ করো। তোমার নিকট আমি রিযিক চাই না। আমিই তোমাকে রিযিক দিই। উত্তম পরিণতি তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য। [সূরায়ে ত্বা-হা : আয়াত ১৩২]

নফল সালাত

সওয়াবের কাজগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হল নফল সালাত। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ اَلصَّلَاةُ

জেনে রেখো! তোমাদের শ্রেষ্ঠ আমল হল সালাত। [মুসনাদে আহমাদ]

নফল সালাত দু' প্রকার

এক প্রকার হল নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোকে 'নাওয়াফেলে মুকাইয়্যাদা' বলা হয়। যেমন দোহার সালাত, বিতরের সালাত।[১৮]

আরেক প্রকার হল, যা কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। এগুলোকে বলা হয় 'নাওয়াফেলে মুতলাকা'।

বিতরের সালাত ও তার আহকাম

বিতরের সালাত আদায় করা খুবই সহজ। কিন্তু এর সওয়াব অনেক বেশি। এ কারণে যে ব্যক্তি এ সালাত আদায় করে না, সে নিন্দিত। ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ বলেন–

مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ عَمَدًا فَهُوَ رَجُلُ سُوْءٌ، لَايَنْبَغِيْ أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ.

ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি বিতরের সালাত পড়ে না, সে মন্দ লোক। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা ঠিক নয়।

---

১৮. হানাফী আলেমদের মতে বিতরেরর সালাত ওয়াজিব।

বিতরের ওয়াক্ত শুরু হয় ইশার সালাতের পর থেকে। ফজরের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে।

বিতরের সর্বনিম্ন রাকআত হল এক, আর সর্বোচ্চ হল এগারো রাকআত। তবে আরও বেশিও পড়া যায়। দু' রাকআত দু' রাকআত করে পড়বে। শেষে এক রাকআত দ্বারা বিতর করবে। তিন রাকআত বিতরও পড়া যাবে।[১৯] দু' রাকআত পড়ে সালাম ফেরাবে।[২০] এরপর শুধু তৃতীয় রাকআত পড়বে। প্রথম রাকআতে সূরায়ে আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে কাফেরূন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরায়ে ইখলাস পড়া মুস্তাহাব।

মুস্তাহাব হল [শেষ রাকআতে] উভয় হাত উঠানো এবং রুকু'র পর কুনুত পড়া।[২১] তাতে আল্লাহর নিকট এই দোয়া করবে–

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَن تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيما أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ ما قَضَيْتَ، فإنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْتَ.

তারাবিহর সালাত

এই সালাত রামাদানে আদায় করা হয়। এটি সুন্নাতে মুআক্কাদা। সালাতটির নাম তারাবিহ হওয়ার কারণ হল, এই সালাত দীর্ঘ হওয়ার কারণে প্রতি চার রাকআত পর তারবিহা করা হয়। [তারবিহা

---

১৯. হানাফী আলেমদের মতে, বিতরের সর্বনিম্ন রাকআত; তিন রাকআত।

২০. হানাফী আলেমদের মতে সালাম না ফিরিয়ে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে।

২১. তাঁদের মতে রুকুর আগেই কুনুত পড়তে হবে এবং কুনুত পড়া ওয়াজিব।

আরবি শব্দ। অর্থ আরাম করা।] তাই এই সালাতকে তারাবিহ বলা হয়। এই সালাত মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করা উত্তম। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

যে-ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাত পড়ে, তার আমলনামায় রাত্রিজাগরণের সওয়াব লেখা হয়। [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন–

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে-ব্যক্তি রামাদানে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় সালাত পড়ে, তার অতীতের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, 'রাসুল ﷺ রামাদান বা রামাদানের বাইরে এগারো রাকআতের বেশি পড়তেন না।' তবে এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ হতে অকাট্য কিছু বর্ণিত নেই। তাই এগারো রাকআতও পড়া যেতে পারে, আবার তেইশ রাকআতও পড়া যেতে পারে। এর বেশি পড়লেও ক্ষতি নেই।[২২]

ফরজ সালাতের সাথের সুন্নাত

ফরজ সালাতের সাথে যে-সব সুন্নাত পড়ার বিধান রয়েছে, সেগুলো অনেক ফজিলতপূর্ণ। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لله كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوّعاً، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلاّ بَنَى الله لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنّةِ أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ...وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ...وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ...وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ

২২. হানাফী আলেমদের মতে বিতরসহ তারাবিহ তেইশ রাকআত পড়বে।

> যে মুসলমান আল্লাহকে খুশি করার জন্য প্রতিদিন ফরজের অতিরিক্ত বারো রাকআত নফল সালাত পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। [সেগুলো হল,] যোহরের আগে চার রাকআত, যোহরের পর দু' রাকআত, মাগরিবের পর দু' রাকআত, ইশার পর দু' রাকআত এবং ফজরের আগে দু' রাকআত। [সহিহ মুসলিম]

এগুলো হল সুন্নাতে মুআক্কাদা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকিদ হল ফজরের সুন্নাতের। হাদিসে আছে–

> رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا
>
> ফজরের সালাতের দু' রাকআত সালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা-কিছু আছে, তার সবকিছু থেকে উত্তম। [সহিহ মুসলিম]

ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত দীর্ঘ না করা উত্তম। প্রথম রাকআতে সূরায়ে ফাতিহার পর সূরায়ে কাফেরূন পড়বে, এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে ইখলাস পড়বে। অথবা প্রথম রাকআতে পড়বে–

> ﴿قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ﴾

আর দ্বিতীয় রাকআতে পড়বে–

> ﴿قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ﴾

তদ্রূপ মাগরিবের পরের দু' রাকআতেও সূরায়ে কাফেরূন ও সূরায়ে ইখলাস পড়বে।

এসব সুন্নাত সালাতের কোনোটা পড়তে না পারলে পরবর্তীতে কাজা পড়া সুন্নাত।[২৩] তদ্রূপ কেউ যদি রাতে বিতরের সালাত পড়তে না

---

[২৩] হানাফী আলেমদের মতে, ফজরের সুন্নাত ব্যতীত কোনো সুন্নাতের কাজা নেই।

পারে, তা হলে দিনের বেলায় তা কাজা পড়ে নেবে। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ نَامَ عَنْ اَلْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ

কেউ যদি বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে, বা পড়তে ভুলে যায়, তা হলে সকাল হলে তা পড়ে নেবে, অথবা স্মরণ হলে পড়ে নেবে। [দারা কুতনি]

তবে বিতর সালাত কাজা পড়ার সময় এক রাকআত বৃদ্ধি করে জোড় রাকআত বানিয়ে নেবে।[২৪] তাই কেউ যদি সব সময় পাঁচ রাকআত পড়ে, তা হলে ছয় রাকআত পড়বে। এভাবে বাকিগুলোর নিয়ম।

জোহার সালাত

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, ' আমার বন্ধু রাসুল ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়ে ওসিয়্যত করেছেন:

صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম রাখার; দোহার দু' রাকআত সালাত পড়ার এবং ঘুমানোর আগে বিতরের সালাত আদায় করার।' [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

নবীজি ﷺ এই সালাতের নাম রেখেছেন ' সালাতুল আউয়াবিন' [তওবাকারীদের সালাত]। বলেছেন,

صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

---

২৪. তবে হানাফী আলেমদের মতে এরূপ করবে না।

আউয়াবিনের সালাতের সময় হল, যখন উটের বাচ্চা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রচণ্ড তাপের কারণে যখন ছোট উটগুলো বসে পড়ে। [সহিহ মুসলিম]

এই সালাতের সময় শুরু হয় সূর্যোদয়ের পনেরো-বিশ মিনিট পর। আর তা দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত পড়া যায়।

সেজদায়ে তেলাওয়াত

সালাত বা সালাতের বাইরে সেজদার আয়াত পাঠ করলে সেজদা করা ওয়াজিব। শ্রবণ করলেও সেজদা করা ওয়াজিব। আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ : يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

আদমসন্তান সেজদার আয়াত পড়ে সেজদা করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূর হয়ে যায়। বলে, 'হায় আফসোস! আদমসন্তানকে সেজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং সে সেজদা করেছে। ফলে সে জান্নাতে যাবে। আর আমাকে সেজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি অস্বীকার করেছি। ফলে আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে'। [সহিহ মুসলিম]

সেজদায়ে তেলাওয়াত করার সময় তাকবির বলবে। ইবনে উমর ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ আমাদের পবিত্র কুরআন পড়ে শোনাতেন। সেজদার আয়াত এলে তিনি আল্লাহু আকবার বলে সেজদা

করতেন। আর আমরাও তার সাথে সেজদা করতাম। [সুনানে আবু দাউদ]

সেজদার মধ্যে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى পড়বে। আর এটাও পড়া যাবে–
سَجَدَ وَجْهِيْ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَه وَصَوَّرَه ، وَشَقَّ سَمْعَه وَبَصَرَه ، بِحَوْلِه وَقُوَّتِه اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا أَجْرًا ، وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا ، وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا ، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَادَ.

বসা থেকে সেজদায় না গিয়ে দাঁড়ানো থেকে যাওয়া ভাল।

নফল সালাত

নফল সালাতের মধ্যে উত্তম হল রাতের সালাত। দিনের নফল থেকে রাতের নফল শ্রেষ্ঠ।

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ (الصَّلَاةِ) الْمَكْتُوْبَةِ اَلصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ

ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল মধ্যরাতের সালাত। [হাদিসটি আসহাবুস্‌সুনান বর্ণনা করেছেন।]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন–

فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

রাতে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যে-মুহূর্তে কোনো মুসলমান বান্দা আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চাইলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন।

তিনি আরও বলেছেন–

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ

তোমরা অবশ্যই কিয়ামুল্লাইল [রাত জেগে সালাত আদায়] করবে। কারণ, এটা তোমাদের আগেকার নেককারদের রীতি। এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়, পাপ মোচন হয়, এবং গোনাহর কাজে বাধা হয়। [মুসতাদরাকে হাকেম]

রাত্রিজাগরণকারীদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

রাতের সামান্য অংশেই তারা নিদ্রা যেত। রাতের শেষ প্রহরে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত। [সূরা যারিয়াত : ১৭-১৮]

আরও ইরশাদ হচ্ছে–

﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

বিছানা থেকে তাদের পার্শ্ব আলাদা থাকে। ভয় ও আশা নিয়ে তারা তাদের প্রভুকে ডাকে। আর আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে তারা দান করে। তাদের আমলের বিনিময়ে চক্ষুশীতলকারী কী কী নিয়ামত গোপন করে রাখা হয়েছে, তা কেউ জানে না। [সূরা সিজদা : ১৬-১৭]

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

কয়েকটি সময় আছে, যেগুলোয় সালাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ সময় হল তিনটি–

১. ফযরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় হয়ে এক বর্শা/বল্লম পরিমাণ উঠা পর্যন্ত। (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পর থেকে মিনিমাম ১৫মিনিট পর্যন্ত। এরপর চাইলে সালাত আদায় করতে পারবে।)

২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়। (দশ মিনিট)

৩. আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত।

উক্বা বিন আমের رضي الله عنه বলেন–

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّىَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

তিন সময় রাসুল ﷺ আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং মৃতদের কবর দিতে নিষেধ করেছেন : সূর্যোদয়ের সময়, তা উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত; ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়, সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়া পর্যন্ত; এবং সূর্যাস্তের সময়, ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। [সহিহ মুসলিম]

এ সময়গুলোতে ফরজ সালাতের কাজা, তাওয়াফের দু' রাকআত ও কারণজনিত সালাত, যেমন জানাযার সালাত, তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং সূর্যগ্রহণের সালাত[২৫] ব্যতীত আর কিছুই পড়া যাবে না।

---

২৫. হানাফী আলেমদের মতে, এসকল সালাতও ওই সময়গুলোতে পড়া যাবে না।

জামাআতের গুরুত্ব ও ফজিলত

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

একাকী সালাত আদায় করা থেকে জামাআতের সালাতের সওয়াব সাতাশ গুণ বেশি। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ ، وَصَلاَةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

মুনাফিকদের ওপর সবচেয়ে ভারী সালাত হল ইশার সালাত ও ফজরের সালাত। ওই দুই সালাতে কী সওয়াব আছে, তা যদি তারা জানত, তা হলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما-কে একব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল, যে রাত জেগে নফল পড়ে এবং দিনের বেলায় সওম রাখে, কিন্তু জামাআতে আসে না। তিনি বললেন, ' সে জাহান্নামে যাবে।'

তবে কোনো উযর থাকলে জামাআতে আসার হুকুম রহিত হয়ে যায়।

ওদের ঘর তো পুড়েই যাচ্ছিল!

সহিহ বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

সে-সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি ইচ্ছে করেছি, কিছু জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেব, আর তা সংগ্রহ করা হবে। এরপর সালাতের নির্দেশ দেব, আর তার জন্য আযান দেওয়া হবে। এরপর একজনকে নির্দেশ দেব, সে লোকদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করবে। এরপর আমি [যারা সালাতে উপস্থিত হয়নি] ওই লোকদের নিকট যাব এবং তাদের সামনেই তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেব। সে-সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তাদের কেউ যদি জানতে পারত যে, [মসজিদে এলে তারা গোশত ছাড়ানো] একটি মোটা হাড় পাবে, বা দুটি সুন্দর খুর পাবে, তা হলে অবশ্যই ইশার সালাতে উপস্থিত হত।

এতে ইবনে উম্মে মাকতুম رضي الله عنه দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি অন্ধ। ঘরও অনেক দূর। আমাকে আনার মতও কেউ নেই। আমার কি বাড়িতে সালাত পড়ার অনুমতি আছে?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟

তুমি কি আযান শুনতে পাও?

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

আল্লাহর রাসুল বললেন–

فَاحْضُرْهَا

তা হলে সালাতে এসো।'

তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার ও মসজিদের মধ্যে খেজুরবাগান আছে, গাছ-গাছাড়ি আছে। আর আমাকে ধরে আনার মত কেউ নেই।'

আল্লাহর রাসুল বললেন–

أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ؟

তুমি কি ইক্বামত শুনতে পাও?

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

আল্লাহর রাসুল বললেন,

فَاحْضُرْهَا

তা হলে উপস্থিত হও।

তাকে বাড়িতে সালাত পড়ার অনুমতি দেননি।

সহিহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ হতে বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তির এই বিষয়টি ভাল লাগে যে, আগামীকাল মুসলমান অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, তা হলে সে যেন, যেসব সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, সেগুলোর হেফাজত করে। কারণ, আল্লাহ ﷻ তোমাদের নবীর জন্য সুনানে-হুদার বিধান দিয়েছেন। আর এগুলো সুনানে-হুদা। জামাআত লঙ্ঘন করে যদি তোমরা ঘরে সালাত পড়, তা হলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত তরক করলে। আর যদি তোমাদের নবীর সুন্নাত তরক কর, তা হলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের যুগে দেখেছি, প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া কেউ জামাআত লঙ্ঘন করত না। এমনও হত যে, মানুষ দু'জনের কাঁধে ভর করে এসে সালাতের কাতারে দাঁড়াত।'

মুসাফিরের সালাত

মুসাফির ব্যক্তি চার রাকআতবিশিষ্ট সালাত দু' রাকআত আদায় করবে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ﴾

তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন সালাত কসর করলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। [সূরা নিসা : ১০১]

যদি কেউ বারবারও সফর করতে থাকে, তা হলেও সে সালাত কসর করবে। যেমন বার্তাবাহক, টেক্সিড্রাইভার।

মুসাফিরের জন্য যোহর ও আসর একসাথে এবং মাগরিব ও ইশা একসাথে এক ওয়াক্তে পড়া জায়েয।[২৬] যে মুসাফিরের জন্য কসর করা জায়েয, তার জন্য দু' সালাত এক ওয়াক্তে পড়াও জায়েয। তবে প্রয়োজন না হলে একত্রে না পড়াই উত্তম।

কেউ যদি সফরের নিয়্যত করে, কিন্তু তখনও নিজ বসতি বা শহর ত্যাগ করেনি, আর এরই মধ্যে সালাতের সময় উপস্থিত হয়, তা হলে সে সফরের সালাত পড়বে না। তার জন্য কসর করা জায়েয হবে না। কারণ, বসতি বা শহর ত্যাগ করার পরই কসরের হুকুম জারি হয়। আর কেউ যদি গাড়ি চড়ে সফর শুরু করে এবং শহরের বাইরে সালাত আদায় করে, তা হলে সে কসর পড়বে।

যদি কেউ বিমানে সফর করে এবং বিমানবন্দর শহরের বাইরে থাকে, আর যদি তার টিকেট বা বুকিং নিশ্চিত [ওকে] থাকে, তা হলে কসর

---

২৬. হানাফী আলেমদের মতে এরূপ করার কোনো সুযোগ নেই।

পড়বে। আর যদি তা না হয়, তা হলে কসর পড়বে না। কারণ, তার সফর অনিশ্চিত।

সালাত পড়ার সময় কসর পড়ার কথা মনে উপস্থিত করার দরকার নেই, যেমন সফর না করার সময় পুরো সালাত পড়ার কথা মনে উপস্থিত করতে হয় না। নিম্নে মুসাফির-সম্পর্কিত কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হচ্ছে।

মুসাফির মুক্তাদি যদি পুরো সালাত পড়ার নিয়ত করে, আর তার ইমাম কসর পড়ে, তা হলে মুক্তাদিও কসর পড়বে, যদি দুজনই মুসাফির হয়।

যদি মুসাফির মুক্তাদি কসর পড়ার নিয়্যত করে, আর তার ইমাম পুরো সালাত পড়ে, তা হলে ইমামের অনুসরণে তাকেও পুরো সালাত পড়তে হবে।

মুসাফির যদি সালাত শুরু করে, এবং কসরের নিয়্যত করতে ভুলে যায়, তা হলে সে কসরই করবে, চাই সে ইমাম হোক বা মুক্তাদি।

ইমাম মুকিম, না কি মুসাফির, তা যদি মুসাফিরের জানা না থাকে, তা হলে ইমাম যা পড়ে, তাকে তা-ই আদায় করতে হবে।

যদি সালাত শুরু করার সময় পুরো সালাত পড়ার নিয়্যত করে, কিন্তু সালাতের মধ্যে স্মরণ হয় যে, সে মুসাফির, তা হলে সে কসরই পড়বে, চাই সে মুকিম হোক বা মুসাফির। কারণ, মুসাফিরের প্রকৃত সালাত হল কসর।

যদি সালাতের শুরুতে কসরের নিয়্যত করে, এবং দ্বিতীয় রাকআতে বসার পর ভুলে উঠে দাঁড়ায়, তা হলে সে ফিরে আসবে এবং সেজদায়ে সাহু করবে।

মুসাফির ব্যক্তি যখন তার উদ্দিষ্ট শহরে পৌঁছবে, সে একা থাকুক বা তার আরও সফরসঙ্গী থাকুক, মুকিম থাকার মতই মসজিদে সালাত পড়বে। সফরের কারণে এতে কোনোরূপ শিথিলতা আসবে না। কারণ, মসজিদে সালাত পড়া-সম্পর্কিত হাদিসে সফরের অবস্থাকে বাদ দেওয়া হয়নি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে—

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

যে ব্যক্তি আযান শুনল, এরপরও মসজিদে এল না, তার সালাত [পূর্ণাঙ্গ] হবে না। তবে কোনো উযর থাকলে ভিন্ন কথা। [সুনানে ইবনে মাজাহ]

ইমাম যদি পূর্ণ সালাত আদায় করে, তার পিছনে ইক্তিদা করে মুসাফিরের জন্য কসর করা জায়েয হবে না, চাই সালাতের শুরুতেই ইক্তিদা করুক বা শেষদিকে। হাদিসে আছে–

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

ইমাম করা হয়েছে তার ইক্তিদা করার জন্য। [বুখারি ও মুসলিম]

অনেক মুসাফির চার রাকআতবিশিষ্ট সালাতের শেষ দু' রাকআতে ইমামের ইক্তিদা করে। আর ওই দু' রাকআত পড়েই সালাত শেষ করে। এটা জায়েয নয়। বরং মুকিম ইমামের পিছনে ইক্তিদা করলে পুরো সালাত পড়তে হবে।

যদি ইক্তিদা করার সময় ইমামকে মুসাফির মনে করে থাকে, এবং শেষ দু' রাকআতে তাকে পেয়ে থাকে, এবং ওই দু' রাকআত আদায় করার পর জানতে পারে যে, ইমাম হলেন মুকিম, তা হলে তাকে পুরো সালাত পড়তে হবে এবং শেষে সেজদায়ে সাহু করতে হবে।

যদি মুসাফির ব্যক্তি মাগরিবের সালাত না পড়ে থাকে, এবং ইশার সালাত আদায়কারী মুসাফির ইমামের পিছনে ইক্তেদা করে, তা হলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকআত আদায় করবে। আর যদি ইমাম মুকিম হন, [যিনি ইশার সালাত চার রাকআত আদায় করছেন,] তা হলে মুক্তাদি তিন রাকআত আদায় করে বসে ইমামের সালাম ফেরানোর অপেক্ষা করবে এবং তারই সাথে সালাম ফেরাবে।

আর যদি মুসাফির ব্যক্তি ইশার সালাত দু' রাকআত পড়ার নিয়্যত করে, আর ইমাম মাগরিবের সালাত পড়ে, তা হলে মুক্তাদি ইশার নিয়্যতে সালাতে শরিক হবে। আর ইমাম সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে চতুর্থ রাকআত আদায় করবে। দু' রাকআত পড়ে সালাত শেষ করা তার জন্য জায়েয হবে না।

জুম'আর সালাত

জুম'আর দিনের ফজিলত

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَم عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুম'আর দিন হল শ্রেষ্ঠ দিন। এ দিনই আদম عليه السلام-কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এ দিনই তাকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর কিয়ামতও হবে জুম'আর দিনে। [সহিহ মুসলিম]

তিনি আরও বলেছেন–

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুম'আর দিন হল শ্রেষ্ঠ দিন। [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

জুম'আর হুকুম

জুম'আ আদায় করতে সক্ষম প্রত্যেক মুকাল্লাফের [শরিয়তের হুকুমের আদিষ্ট] ওপর তা ফরজে আইন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ

হে ঈমানদারগণ! জুম'আর দিন যখন সালাতের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর যিকরের দিকে [সালাতের দিকে] দৌড়ে যাও! [সূরা জুমআ : আয়াত : ৯]

কেউ যদি জুম'আর সালাতে উপস্থিত হতে না পারে, তা হলে যোহরের চার রাকআত সালাত পড়বে।

সহিহ মুসলিমে আছে, জুম'আর সালাতে উপস্থিত না হওয়া একটি সম্প্রদায়কে লক্ষ করে নবীজি ﷺ বলেছিলেন–

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّ بِالنَّاسِ أَوْ لِلنَّاسِ ، ثُمَّ يُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ

আমার তো ইচ্ছা হয়েছিল, কাউকে সালাত পড়াতে বলে আমি এমনসব লোকের বাড়ি পুড়িয়ে দিই, যারা জুম'আর সালাতে না এসে বাড়িতে বসে থাকে।

তিনি আরও বলেছেন–

مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

যে ব্যক্তি অবহেলা করে তিনটি জুম'আ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন। [সহিহ বুখারি ব্যতীত সিহাহ সিত্তার বাকি পাঁচ কিতাব]

তিনি আরও বলেছেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِ الْجُمْعَةِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

[জমু'আর সালাত তরককারী] লোকেরা জুম'আ তরক করা থেকে ফিরে আসুক। নচেৎ আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন, এবং তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। [সহিহ মুসলিম]

জুম'আর সালাতের ওয়াক্ত

যোহরের ওয়াক্তই হল জুম'আর ওয়াক্ত। অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার সাথে সাথেই এই সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়, এবং আসরের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বাকি থাকে। তবে আজকাল মানুষ জুম'আর সালাতে আসতে বিলম্ব করে। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

যে ব্যক্তি জুম'আর দিন জানাবতের গোসল করে, এরপর মসজিদে যায়, সে যেন একটি উট কুরবানি দিল। আর যে আরও পরে যায়, সে যেন একটি গরু কুরবানি দিল। আর যে আরও পরে যায়, সে যেন একটি শিংযুক্ত মেষ কুরবানি দিল। আর যে আরও পরে যায়, সে যেন একটি মুরগি দান করল। আর যে আরও পরে যায় সে যেন একটি ডিম দান করল। আর ইমাম বেরিয়ে এলে ফেরেশতারা যিকির [তথা আলোচনা] শোনার জন্য এসে যায়। [সহিহ বুখারি]

আর এই মুহূর্তগুলো শুরু হয় সূর্যোদয় থেকে, এক উক্তিমতে, ফজরের সময় থেকে।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন–

إِذا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةً يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ ، وَجَاءُوْا يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرِ

জুম'আর দিন এলে মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে প্রথমে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকে। ... ইমাম সাহেব বসে পড়লে তারা তাদের লেখার কাগজ গুটিয়ে নেয় এবং যিকির [ইমামের আলোচনা বা খুতবা] শোনার জন্য চলে আসে। [সহিহ বুখারি]

এ কারণেই আগেকার নেককাররা আগে আগে মসজিদে চলে যেতেন এবং নফল সালাত, যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতে লেগে যেতেন।

আর জুম'আর আগে কোনো কোনো সাহাবি দশ রাকআত পড়তেন, কেউ বারো রাকআত, কেউ আট রাকআত পড়তেন।

ইমাম যরকশি বলেন, 'জুম'আর সালাতে পরবর্তীরা যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তার একটা হল, তারা জুম'আয় আসতে বিলম্ব করে। ... আগেকার লোকদের দেখা যেত, তাদের কেউ কেউ হাতে বাতি নিয়ে আসতেন। অর্থাৎ তারা রাতের অন্ধকার থাকতেই জুম'আর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন।'

সকাল সকাল জুম'আর সালাতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া আল্লাহর ভালবাসারই নিদর্শন। কিয়ামতের দিন তারা তার সান্নিধ্য লাভ করবে।

জুম'আর আদব

জুম'আর সালাতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে আসা মুস্তাহাব। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى ، وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا
>
> যে-ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করায়, এবং নিজে গোসল করে, আগে আগে মসজিদে যায়, এবং পায়ে হেঁটে যায়, [কোনো বাহনের ওপর] আরোহণ করে নয়, এবং ইমামের কাছাকাছি বসে, মনোযোগ দিয়ে ইমামের কথা শোনে, কোনো অর্থহীন কাজ করে না, সে ব্যক্তি প্রতি কদমে এক বছর [নফল] সালাত পড়ার ও সওম রাখার সওয়াব পাবে।

মসজিদে যাওয়ার পথে তিলাওয়াত বা যিকরে মশগুল থাকা মুস্তাহাব।

আর সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে সেজেগুজে যাওয়া এবং সুগন্ধ ব্যবহার করা মুস্তাহাব। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ

لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا

যে-ব্যক্তি জুম'আর দিন উত্তমরূপে গোসল করল, তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করল এবং সুগন্ধ ব্যবহার করল, যদি তার নিকট থাকে, এরপর মসজিদে এল, কারও ঘাড় টপকে সামনে গেল না, এরপর আল্লাহ তাআলা যতটুকু লিখে রেখেছেন, সালাত পড়ল, এরপর ইমাম বেরিয়ে এলে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ রইল, তার এই সালাতটি এই জুম'আ ও পূর্ববর্তী জুম'আর মধ্যকার গোনাহর জন্য কাফ্‌ফরা হবে। [ইবনে হিব্বান ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ।]

মসজিদে প্রবেশ করে যদি দেখে ইমাম খুতবা দিচ্ছেন, তা হলেও তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু' রাকআত সালাত না পড়ে বসবে না। সালিক গিতফানি ﷺ নামক এক সাহাবি মসজিদে প্রবেশ করলেন। রাসুল ﷺ তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বসে পড়লেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ

তুমি কি দু' রাকআত পড়েছ?

তিনি বললেন, 'না।' তিনি বললেন–

قُمْ فَارْكَعْهُمَا

ওঠো! দু' রাকআত পড়ে নাও।[২৭]

মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাবে না। নবীজি ﷺ একব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, সে লোকদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন–

---

২৭. হানাফী আলেমদের মতে, খুতবার সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া যায় না। রাসুল ﷺ ওই সাহবিকে কোন সালাত পড়তে বলেছিলেন, তাও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ

বসে পড়ো! তুমি বিলম্বও করলে, লোকদের কষ্টও দিলে।[২৮]

জুম'আর দিনে অথবা জুম'আর রাতে সূরায়ে কাহফ পড়া মুস্তাহাব। এতে দু' জুম'আর মধ্যকার গোনাহ মাফ হয়ে যায়। [বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের পর থেকে জুম'আর রাত শুরু হয়।]

জুম'আর দিনে ও রাতে বেশি বেশি দোয়া করবে। কারণ, এতে জুম'আর দিনের যে-মুহূর্তের দোয়া কবুল হয়, সে-মুহূর্তের সাথে মিলে যাওয়ার আশা থাকে। নবীজি ﷺ বলেছেন–

فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, ওই মুহূর্তে যে মুসলমান সালাত পড়ে দোয়া করতে থাকে, তা যদি ওই মুহূর্তে হয়ে যায়, তা হলে আল্লাহ তাআলা তাকে তা অবশ্যই দান করবেন।' এ কথা বলে তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বোঝালেন, সময়টা খুবই সামান্য। [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

এই দিনে বা রাতে বেশি বেশি সদকা করা এবং ভাল কাজ করা উত্তম।

এই দিনে বা রাতে বেশি বেশি দরূদ শরিফ পড়া মুস্তাহাব। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ

তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হল জুম'আর দিন। তাই এই দিনে আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ শরিফ পাঠ করো। কারণ, তোমাদের দরূদ আমার সামনে পেশ করা হয়। [সুনানে আবু দাউদ]

---

২৮. প্রাগুক্ত

তিনি আরও বলেছেন–

أَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

জুম'আর রাত ও দিনে আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ শরিফ পাঠ করো। কারণ, যে ব্যক্তি আমার ওপর এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার ওপর দশটি রহমত প্রেরণ করবেন। [ভালো সনদে বাইহাকি বর্ণিত]

মসজিদে যাওয়ার পথে এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে জট পাকানো মাকরূহ। তদ্রূপ যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষায় থাকবে বা খুতবা শুনবে, ততক্ষণ যে-কোনো অর্থহীন কাজ করা মাকরূহ।

খুতবা শোনার সময় তন্দ্রা এলে সেরূপ করবে, যেরূপ করতে নবীজি ﷺ বলেছেন–

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ

মসজিদে থাকার সময় কারও তন্দ্রা এলে বসার জায়গা পরিবর্তন করবে। [সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ]

জুম'আর জন্য গোসল করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন।

জুম'আর সালাতের পর চার রাকআত সালাত পড়বে।

খতিব সাহেব যদি নবীজির ﷺ নাম উচ্চারণ করেন, তা হলে অনুচ্চ আওয়াজে দরূদ শরিফ পাঠ করবে।

খতিব যে দোয়া করবেন, সেখানে অনুচ্চ আওয়াজে আমিন বলা মুস্তাহাব।

মসজিদে এসে খতিবকে খুতবারত অবস্থায় পেলে সালাম করবে না। বরং ধীরস্থিরভাবে কাতারে এসে দু' রাকআত সালাত পড়বে। এরপর মন দিয়ে খুতবা শুনবে। পাশে বসা ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করবে না।

খুতবা চলাকালে নীরব থাকা চাই। কোনোরূপ কথা বলবে না। নবীজি ﷺ বলেছেন,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ

জুম'আর দিন খুতবা চলাকালে যদি তোমার ভাইকে বলো, চুপ হও! তা হলে তুমি অর্থহীন কাজ করলে। [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

খুতবার সময় ইমাম মুসল্লিদের কারো কারো সাথে কথা বলতে চাইলে বলতে পারবেন। তবে খুতবা চলাকালীন কেউ হাতের দ্বারা, নক, দাড়ি, কাপড়, চাদর দ্বারা খেলা করা করবে না। নবীজি ﷺ বলেছেন,

مَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمْعَةَ لَهُ

[খুতবা চলাকালে] যে পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সে অর্থহীন কাজ করল, আর যে অর্থহীন কাজ করে তার জুমা হয় না। [ইমাম তিরমিযি রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

খুতবার সময় অযথা এদিক-ওদিক তাকাবে না। লোকদের দিকেও তাকাবে না। কারণ, এতে খুতবা থেকে মনোযোগ সরে পড়বে।

হাঁচি এলে মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ বলবে।

দুই খুতবার মাঝখানে ইমাম সাহেব বসলে প্রয়োজনীয় কথা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সেরে নেওয়া যাবে।

কেউ কোথাও প্রমোদভ্রমণে গেল, বা পিকনিকে গেল। আশেপাশে জুম'আ পড়ার কোনো মসজিদ নেই। তা হলে তাদের ওপর জুম'আ ফরজ থাকবে না। তাদের সংখ্যা যতই হোক না কেন, তারা যোহরের সালাত পড়বে। কারণ, জুম'আর জন্য স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া শর্ত।

কেউ যদি বিলম্বে এসে ইমামের সাথে এক রাকআত পায়, তা হলে বাকি এক রাকআত পড়ে জুম'আর সালাত আদায় করবে। আর যদি এক রাকআতের কম পায়, যেমন তাশাহহুদ পেল, বা দুই সেজদা পেল, তা হলে তার জুম'আ পাওয়া হবে না।[২৯] যোহরের নিয়্যতে

[২৯] হানাফী আলেমদের মতে, তাশাহহুদ পাওয়া মানেই জামাত পাওয়া।

ইমামের সাথে শরিক হবে। ইমাম সালাম ফেরালে যোহরের চার রাকআত সালাত পড়বে।

জুম'আর সালাতের জন্য সালাতের আগে দুটি খুতবা পড়তে হবে। তবে খুতবা লম্বা হওয়ার শর্ত নেই। বরং সেখানে আল্লাহ ﷻ-র প্রশংসা, শাহাদাতাইন [আল্লাহ ﷻ-র একত্বের ও আল্লাহর রাসুলের সত্যতার সাক্ষ্য], নবীজি ﷺ-র ওপর দরূদ, তাকওয়ার নসিহত, কুরআনের সামান্য অংশ তেলাওয়াত ইত্যাদি পাওয়া গেলেই চলবে।

উপস্থিত মুসল্লিদের বোধশক্তি অনুযায়ী খুতবা সহজ করা সুন্নাত। মিম্বরে উঠে প্রথমে বসবে। মুআয্যিনের আযান শেষ হলে দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করবে। উভয় খুতবার মধ্যখানে বসবে। খুতবা পড়ার সময় ডানে-বাঁয়ে বেশি তাকাবে না। কারণ, নবীজি ﷺ এ ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে মনোযোগী হবে। খুতবা দীর্ঘ না করে ভারসাম্যপূর্ণ করবে, যেন উপস্থিত ব্যক্তিদের মনে বিরক্তিবোধ সৃষ্টি না হয়। উঁচু আওয়াজে খুতবা পড়া সুন্নাত। কারণ, নবীজি ﷺ-এর খুতবা পড়ার সময় তার আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত, তার ক্রোধ বৃদ্ধি পেত। তা ছাড়া এভাবে পড়া হলে তা মানুষের মনে ভালভাবে বসে। আর খুতবার মধ্যে মুসলমানদের দীন-দুনিয়ার কল্যাণ ও শান্তির জন্য দোয়া করবে। খুতবা শেষ করে সালাতে দাঁড়াবে।

জুম'আর সালাত দু' রাকআত। ক্বিরাআত উঁচু আওয়াজে পড়বে। সূরায়ে ফাতিহার পর প্রথম রাকআতে সূরায়ে আ'লা ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে গাশিয়াহ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ পড়া সুন্নাত। অথবা প্রথম রাকআতে সূরায়ে জুম'আ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে মুনাফিকুন পড়বে।

সত্তর বছর সালাত ফউত হয়নি!

সাঈদ বিন আব্দুল আজিজ ﵀ যদি কখনও জামাআতে সালাত পড়তে না পারতেন, তিনি ক্রন্দন করতেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব ﵀-র চল্লিশ বছর এমন অতিবাহিত হয়েছে যে, যখন সালাতের আযান হত, তিনি মসজিদেই থাকতেন।

ইমাম আ'মাশ ﵀-র প্রায় সত্তর বছর এমন কেটেছে যে, এর মধ্যে তার তাকবিরে-উলা ছোটেনি।

সুলাইমান মুকাদ্দেসি ﵀-কে জামাআতের সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তার বয়স প্রায় নব্বই। তিনি বললেন, 'দু' ওয়াক্ত সালাত ছাড়া কখনও আমি ফরজ সালাত একাকী পড়িনি। ওই দু' ওয়াক্তের ব্যাপারে আমার মনে হয়, যেন আমি ওই সালাত পড়িইনি।'

হাতেমে আসাম্ম ﵀ বলেন, 'একবার আমি জামাআত পাইনি। এতে একমাত্র আবু ইসহাক বুখারিই আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। অথচ আমার কোনো সন্তান মারা গেলে দশ হাজারের বেশি লোক আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসত।'

রবি' বিন খাইসাম রহ.র দেহ সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। দু' ব্যক্তির ওপর ভর করে তাকে মসজিদে নেওয়া হত। সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করতেন, 'আবু ইয়াজিদ! আল্লাহ ﷻ তোমার জন্য অবকাশ রেখেছেন। ঘরেই যদি সালাত পড়ে নিতে... ।' তিনি বলতেন, 'আমি শুনতে পাই, মুআযযিন ডাকছেন– حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ। [কল্যাণের দিকে দৌড়ে এসো!] তোমাদের কেউ যদি কল্যাণের দিকে যাওয়ার আহ্বান শোনে, হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে সাড়া দেওয়া চাই।'

ঈদের সালাত

ইসলামে মাত্র দুটো ঈদ আছে—ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। নতুন কোনো ঈদ আবিষ্কার করে তাতে বৃদ্ধি করা জায়েয নেই। যেমন মাতৃদিবস, শিক্ষাদিবস বা ভালবাসা-দিবস, ইত্যাদি। এগুলো হল দীনে নবসংযোজন, এবং কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন, চাই এগুলোর নাম ঈদ [উৎসব] রাখা হোক বা দিবস রাখা হোক। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন—

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

> যে অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। [মুসনাদে আহমাদ]

ঈদের সালাতের দলিল

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন—

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

> তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো, এবং কুরবানি করো। [সূরা কাউসার : ২]

অর্থাৎ ঈদের সালাত পড়ো। এরপর তোমার কুরবানির পশু জবাই করো।

নবীজি ﷺ সর্বপ্রথম ঈদুল ফিতরের সালাত পড়েন দ্বিতীয় হিজরিতে। এরপর থেকে আমৃত্যু তিনি ঈদের সালাত আদায় করেন, কখনও বাদ দেননি।

শহরের নিকটবর্তী মাঠে ঈদের সালাত সুন্নাত। কারণ, নবীজি ﷺ, মদিনা প্রবেশের মুখে যে মাঠ রয়েছে, সেখানে ঈদের সালাত পড়তেন। তবে মক্কা এই হুকুমের ব্যতিক্রম। সেখানে মসজিদে হারামেই ঈদের সালাত পড়বে। ঈদের সালাত পড়ার জন্য মাঠে এসে ঈদের সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত পড়বে না।

সূর্যোদয়ের ১৫মিনিট পরই ঈদের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর তা সূর্য ঢলে যাওয়া [যোহরের ওয়াক্ত হওয়া] পর্যন্ত বাকি থাকে। ঈদুল আজহার সালাত তাড়াতাড়ি পড়ে নেওয়া সুন্নাত। এতে সালাত শেষ করে মানুষ কুরবানি করতে পারবে। আর ঈদুল ফিতরের সালাত বিলম্ব করা সুন্নাত। তা হলে ঈদ আসার আগেই প্রত্যেকে নিজ নিজ ফিতরা আদায় করে আসার যথেষ্ট সময় পাবে।

ঈদুল ফিতরের সালাতে যাওয়ার আগে খেজুর খাওয়া সুন্নাত। ঈদুল আজহার দিন সালাতের আগে কিছু না খাওয়া সুন্নাত। কারণ, নবীজি ﷺ ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু না খেয়ে বের হতেন না। আর ঈদুল আজহার দিনে সালাতের আগে কিছু খেতেন না। [মুসনাদে আহমাদ]

ঈদের সালাতের জন্য সাজগোজ করা সুন্নাত। নবীজি ﷺ-র একজোড়া পোশাক ছিল, যেগুলো তিনি দুই ঈদ ও জুম'আর দিন পরিধান করতেন। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه ঈদের দিন তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন।

ঈদের সালাত দু' রাকআত। খুতবার আগে পড়তে হবে। এই সালাতে আযান-ইকামত নেই। হাদিসে আছে–

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاؤُهُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

নবীজি ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদিন খুতবার আগে ঈদের সালাত পড়তেন। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

ঈদের সালাতের পর খুতবা পড়া সুন্নাত। আর তা মনোযোগ দিয়ে শোনা ওয়াজিব।

ঈদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি

প্রথমে তাকবিরে-তাহরিমা বাঁধবে। এরপর সানা পড়বে। এরপর ছয় তাকবির বলবে।[৩০] এখানে তাকবিরে তাহরিমা সালাতের রুকন। বাকি তাকবিরগুলো সুন্নাত।[৩১] এরপর সূরায়ে ফাতিহা পড়বে। আর দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআতের আগে পাঁচটি তাকবির বলবে।[৩২] প্রত্যেক তাকবিরের সাথে হাত উঠাবে। কারণ, নবীজি ﷺ প্রত্যেক তাকবিরের সাথে হাত উঠাতেন। ইবনে কাইয়্যেম রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রতি দু' তাকবিরের মাঝে নবীজি ﷺ সামান্য বিরতি দিতেন। এ সময় কোনো দোয়া পড়েছেন বলে বর্ণিত নেই।

ক্বিরাআত শুরু করার পর কেউ যদি সালাতে শরিক হয়, তা হলে সে শুধু তাকবিরে তাহরিমার একটি তাকবির বলবে।[৩৩]

ঈদের সালাত দু' রাকআত। এই সালাতের ক্বিরাআত উচ্চ স্বরে পড়বে। নবীজি ﷺ প্রথম রাকআতে সূরায়ে আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে গাশিয়াহ পড়তেন। [মুসনাদে আহমাদ]

অথবা প্রথম রাকআতে সূরায়ে ক্বাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে ক্বামার পড়বে। [সহিহ মুসলিম]

সালাত শেষ করার পর দুটি খুতবা পাঠ করবে। দুটোর মাঝখানে বসবে। এরপর লোকজন চলে যাবে। এই সালাতের পর কোনো সালাত নেই।

ঈদের সালাতে মেয়েদের আসা মুস্তাহাব।

যে ব্যক্তি ঈদের সালাত মোটেই পায়নি বা কিছুটা পায়নি, সে দু' রাকআত কাজা আদায় করবে।[৩৪] এবং তাকবির সহকারে আদায়

---

৩০. হানাফী আলেমদের মতে, তিন তাকবির বলবে।

৩১. হানাফী আলেমদের মতে, ওয়াজিব।

৩২. হানাফী আলেমদের মতে, দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর আগে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবে।

৩৩. হানাফী আলেমদের মতে, ঈদের তাকবিরও বলতে হবে।

৩৪. হানাফী আলেমদের মতে, ঈদের সালাতের কাজা নেই।

করবে। এসে যদি দেখতে পায়, ইমাম সাহেব খুতবা দিচ্ছেন, তা হলে খুতবা শোনার জন্য বসে পড়বে। খুতবা শেষ হলে সালাত পড়ে নেবে। কাজা একাকীও পড়া যাবে; আবার জামাআতের সাথেও পড়া যাবে।

উভয় ঈদের দিন বেশি বেশি তাকবির বলা সুন্নাত। তাকবির উচ্চ স্বরে বলবে। ঈদুল ফিতরের সময় ঈদের রাত থেকেই [আগের দিনের সূর্যাস্তের পর থেকে] তাকবির বলা শুরু করবে। আর ঈদের সালাত শুরু হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ করবে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾

> যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং তোমাদেরকে হেদায়াত দান করার কারণে যেন তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা কর। [সূরা বাকারা : ১৮৫]

বাড়ি, বাজার বা মসজিদ, সবখানে, যেখানে আল্লাহর যিকির করা জায়েয, উচ্চ স্বরে তাকবির বলবে। আর ঈদগাহে যাওয়ার সময় উচ্চ স্বরে তাকবির বলবে। ঈদের দিন হলে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত ইবনে উমর رضي الله عنه উচ্চ স্বরে তাকবির বলতেন। এরপর ইমাম সাহেব আসা পর্যন্ত তাকবির বলতেন।

ঈদুল আজহায় যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ থেকেই, এবং সব সময় তাকবির বলবে। আর প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর প্রত্যেকেই মনে মনে তাকবির বলবে। এই তাকবির সম্মিলিতভাবে বলবে না। তবে আরাফার দিন ফজরের পর থেকে নিয়ে তাশরিকের শেষ দিন আসর পর্যন্ত ফরজ সালাতের পরই তাকবির [তাকবিরে মুকাইয়্যাদা] বলবে। যারা হজ্জে আছেন, এবং যারা হজ্জের বাইরে আছেন, সবার তাকবির হবে একই শব্দে। তবে হাজিরা তাকবির [তাকবিরে মুকাইয়্যাদা] শুরু করবেন ঈদের দিন যোহরের পর থেকে, আর শেষ করবেন তাশরিকের শেষ দিন আসরের পর। কারণ, এর আগে তারা তালবিয়া পাঠে ব্যস্ত থাকেন। তাকবিরের শব্দ হল–

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ

ঈদে একে অপরকে অভিবাদন জানানোয় ক্ষতির কিছু নেই।

সূর্যগ্রহণের সালাত

আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে সূর্যগ্রহণের সালাত সুন্নাতে মুআক্কাদা। নবীজি ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে শঙ্কিত হয়ে তিনি দ্রুত মসজিদে গেলেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত পড়লেন। তাদের জানালেন, সূর্যগ্রহণ হল আল্লাহ ﷻ-র কুদরতের একটি নিদর্শন। এর দ্বারা আল্লাহ ﷻ তার বান্দাদের ভয় প্রদর্শন করেন। এটা অনেক সময় আল্লাহ ﷻ-র আযাব নাযিল হওয়ার কারণ হয়। তাই তাদেরকে এই সময় দোয়া, ইসতিগফার ও সদকা করার নির্দেশ দিলেন।

সূর্যগ্রহণের সালাতের সময়

সূর্যগ্রহণ শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকে নিয়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত হল এই সালাতের সময়। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

এই রকম কিছু দেখলে তোমরা সালাতে লেগে যাও। আর সূর্য পুরোপুরি গ্রাসমুক্ত হওয়া পর্যন্ত সালাত পড়তে থাকো। [সহিহ মুসলিম]

সূর্যগ্রহণ শেষ হওয়ার পর যদি সে-সম্পর্কে জানা যায়, তা হলে এই সালাত পড়বে না। কারণ, সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেছে।

সূর্যগ্রহণের সালাত পড়ার পদ্ধতি

সূর্যগ্রহণের সালাত দু' রাকআত। এই সালাতের কিরাআত উচ্চ স্বরে পড়বে। প্রথম রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা ও দীর্ঘ একটি সূরা পড়বে। যেমন সূরায়ে বাকারা বা এ রকম অন্য সূরা। এরপর কিয়ামের মতই

দীর্ঘ রুকু' করবে। এরপর سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه এবং رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলে মাথা তুলবে। এরপর সূরায়ে ফাতিহা ও আগের সূরা থেকে ছোট একটি সূরা পড়বে। এরপর রুকু' করবে। রুকু'তে দীর্ঘক্ষণ থাকবে। এরপর سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه এবং رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَ مِلْءُ الْاَرْضِ وَ مِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ বলে মাথা উঠাবে। এরপর দীর্ঘ দুটি সেজদা করবে। দু' সেজদার মাঝখানের বৈঠক লম্বা করবে না। এরপর প্রথম রাকআতের মতই দীর্ঘ দুটি রুকু' ও দুটি সেজদা দিয়ে দ্বিতীয় রাকআত আদায় করবে। এরপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফেরাবে। এই সালাত জামাতের সাথে পড়বে। একাকী পড়াও জায়েয।

সূর্যগ্রহণ শেষ হওয়ার আগেই যদি সালাত শেষ হয়ে যায়, তা হলে দোয়া ও যিকরে লেগে যাবে। আর যদি সালাতে থাকতে থাকতেই সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে যায়, তা হলে সংক্ষেপে বাকি সালাত শেষ করবে, সালাত ছেড়ে দেবে না।

ষাট বছরের সালাতে ভুল হয়নি কখনও

আলী বিন হুসাইন رحمه الله। অযু করলে তার দেহে কম্পন সৃষ্টি হত। দেহে ঘাম দেখা দিত। লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আরে বোঝ না! আমি এখন কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি?'

মুসলিম বিন ইয়াসার। তার সম্বন্ধে তার এক সাথি বর্ণনা করেন, 'আমি মুসলিম বিন ইয়াসারকে সালাতে কখনও এদিক-ওদিক ভ্রূক্ষেপ

করতে দেখিনি, সালাত সংক্ষিপ্ত হোক বা দীর্ঘ। একবার মসজিদের একপাশ ভেঙ্গো পড়েছিল। এর প্রচণ্ড আওয়াজে বাজারের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। অথচ তিনি মসজিদেই সালাত পড়ছিলেন, তাদের দিকে ক্ষণিকের জন্যও চোখ ফেরাননি।'

ইবনে সিরিন ﵀ বলেন, ' একবার মসজিদে মুসলিম বিন ইয়াসারের সালাত দেখলাম। তিনি সেজদা হতে মাথা তুললেন। সেজদার জায়গায় তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে যেন পানি ঢেলে দেওয়া হয়েছে। অথচ তা ছিল তার চোখের পানি।'

ইবনে আউন ﵀ বলেন, ' মুসলিম বিন ইয়াসার ﵀-কে দেখলাম, তিনি সালাত পড়ছেন। ঠিক যেন একটি খুঁটি। কোনো পায়ের ওপর ভর পরিবর্তন করেননি। তার কাপড়ও নড়ছিল না।'

কাসির হিমসি ﵀-র ঘটনা। তিনি ষাট বছর ধরে হিমসবাসীদের সালাত পড়িয়েছিলেন। দীর্ঘ এ সময়ে সালাতে কখনও তার ভুল হয়নি। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ' মসজিদের দরজায় প্রবেশ করলে আমার মনে আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কিছুই থাকে না।'

ইসতিসকার সালাত

ইসতিসকা অর্থ হল আল্লাহ ﷻ-র নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা। বৃষ্টি যখন বন্ধ হয়ে যায় এবং মাটি শুকিয়ে যায়, তখন এই সালাত পড়ার বিধান রয়েছে।

ইসতিসকার সালাত হল সুন্নাতে মুআক্কাদা, যেমনটা বুখারি ও মুসলিমের হাদিস দ্বারা বোঝা যায়।

আদায়ের পদ্ধতি

ঈদের সালাতের মতই এই সালাত শহরের বাইরে খোলা ময়দানে পড়া মুস্তাহাব। আর এর আহকামও ঈদের সালাতের আহকামের মত। সালাতও তত রাকআত, তাকবিরও ততগুলো, ক্বিরাআতও সেই রকম উচ্চ স্বরে পড়বে। আর সালাত পড়বে খুতবার আগে।

ইসতিসকার সালাতে ইমাম সাহেব বেশি বেশি দোয়া ও ইসতিগফার করবেন। দোয়ার সময় তিনি হাত উঠাবেন। কারণ, ইসতিসকার দোয়ার সময় নবীজি ﷺ হাত উঠাতেন।

দোয়ার শেষ দিকে ইমাম ক্বিবলার দিকে ফিরবেন এবং চাদর উল্টাবেন। ডান দিকেরটা বাম দিকে, এবং বাম দিকেরটা ডান দিকে করবেন। এতে চাদরের বাহিরের অংশ ভিতরে, এবং ভিতরের অংশ বাইরে আসবে। মুক্তাদিরাও তদ্রূপ নিজেদের চাদর উল্টাবেন। এর রহস্য হল, অবস্থা পরিবর্তের লক্ষণ নেওয়া। অর্থাৎ কঠিন থেকে সহজের দিকে পরিবর্তনের সুলক্ষণ নেওয়া। এতে বৃষ্টি হলে তো ভাল। নচেৎ বারবার ইসতিসকার সালাত পড়তে থাকবে। কারণ, বৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। তাই বৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত সালাত পড়বে।

জানাযার আহকাম

তওবা করে ও মানুষের অধিকার আদায় করে দিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ করা সুন্নাত। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ

স্বাদ হরণকারী বস্তুর বেশি বেশি আলোচনা করো। [মুস্তাদরাকে হাকেম]

এক. রুগ্ন ও মৃত্যুপথযাত্রীর আহকাম

মানুষ যখন কোনো রোগে আক্রান্ত হয়, তার উচিত ধৈর্য ধারণ করা ও সওয়াবের আশা রাখা। হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করানো জায়েয হবে না। হাদিসে আছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

আল্লাহ যা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, তাতে তোমাদের রোগমুক্তি রাখেননি। [সহিহ বুখারি]

আর শরাবের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّهُ لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

ওটা তো ঔষধ নয়, রোগ। [সুনানুত তিরমিযি]

তদ্রূপ গণক, জাদুগর, জীন-বশকারী এবং ভেলকিবাজদের দিয়ে চিকিৎসা করানোও হারাম। কারণ, এগুলো ইসলামি আকিদার পরিপন্থী। সুস্থতালাভ থেকে আকিদা ঠিক রাখার গুরুত্ব বেশি।

রোগীর শুশ্রূষা করা সুন্নাত। তবে তার নিকট দীর্ঘক্ষণ বসবে না। অবশ্য রোগী যদি তা চায়, তা হলে ভিন্ন কথা। আর তাকে এ বলে সাহস জোগাবে–

لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ

ভয়ের কোনো কারণ নেই। আল্লাহ ﷻ চাহেন তো সুস্থ হয়ে যাবে।

তাকে আনন্দ দিতে চেষ্টা করবে। তার সুস্থতার জন্য দোয়া করবে। আর কুরআন দ্বারা ঝাড়ফুঁক করবে, বিশেষ করে সূরায়ে ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে।

ওসিয়্যত লিখে রাখা সুন্নাত। আর কল্যাণমূলক কাজের জন্য মাল থেকে কিছু ওসিয়্যত করবে। দেনা-পাওনার হিসাব লিখে রাখবে। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ وَعِنْدَهُ مَا يُوصِي فِيهِ ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ.

কোনো মুসলমানের ওসিয়্যত করার মত কিছু থাকলে ওসিয়্যত ছাড়া দুটি রাতও কাটানোর অধিকার তার নেই। [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

মৃত্যুর সময় হলে উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য তাকে কালিমায়ে তাইয়্যেবার তালকিন দেওয়া সুন্নাত। তালকিন দেবে সহজ ও নরমভাবে। তবে বেশি বেশি বলবে না। নবীজি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ইরশাদ করেছেন–

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ

তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীদের لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ-এর তালকিন দাও। [সহিহ মুসলিম]

তিনি আরও বলেছেন–

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যার শেষ কথা হবে لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [সহিহ বুখারি]

এই সময় তাকে ক্বিবলার দিকে মুখ করে দেওয়া মুস্তাহাব।

দুই. মৃত্যুর আহকাম

কারও মৃত্যু হলে তার নিকট উপস্থিত ব্যক্তি মৃতের চোখ বন্ধ করে দেবে। এটা মুস্তাহাব। কারণ, আবু সালামা ﵁-র মৃত্যু হলে নবীজি ﷺ তার চোখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন–

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ». فَلاَ تَقُوْلُوْا إِلاَّ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»

মানুষের আত্মা যখন কব্জা করা হয়, দৃষ্টি সেটাকে অনুসরণ করে। তাই তোমরা ভাল বৈ মন্দ বোলো না। কারণ, তোমাদের কথার ওপর ফেরেশতারা আমিন বলে। [সহিহ মুসলিম]

মৃত্যুর পর কাপড় দিয়ে মৃতকে ঢেকে দেওয়া সুন্নাত। আয়েশা رضي الله عنها বলেন,

حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ

> নবীজির ﷺ মৃত্যু হলে তাকে ডোরাকাটা একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

মৃত্যুর পর অবিলম্বে মৃতের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবে। নবীজির ﷺ ইরশাদ রয়েছে–

لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ

> কোনো মুসলমানের মৃতদেহ তার পরিবারের মাঝে বেশিক্ষণ রাখা উচিত নয়। [সুনানে আবু দাউদ]

মৃত্যুর পর অনতিবিলম্বে তার ওসিয়্যত পূরণ ও ঋণ আদায় করবে, চাই ঋণ আল্লাহর হোক, যেমন যাকাত, হজ্জ বা কাফ্ফারা, কিংবা বান্দার হোক, যেমন আমানত বা ঋণ।

তিন. মৃতকে গোসল

পুরুষকে পুরুষ এবং মহিলাকে মহিলা গোসল দেবে। তবে স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে[৩৫] গোসল দিতে পারবে।

মুসলমানের জন্য কোনো কাফেরকে গোসল দেওয়া, বা তার মরদেহ বহন করা বা তাকে কাফন পরানো কিংবা তার জানাযার সালাত পড়া বা জানাযার পিছু পিছু যাওয়া জায়েয নেই। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾

> কখনও ওদের কোনো মৃতের সালাত পড়ো না এবং তার কবরে দাঁড়িয়ো না। ওরা আল্লাহ ও তার রাসুলকে অস্বীকার করেছে। [সূরা তাওবা : আয়াত : ৮৪]

---

[৩৫] হানাফী আলেমদের মতে, স্বামী তার স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না।

আর তাকে দাফনও করবে না। তবে দাফন করার মত তাদের কেউ না থাকলে মুসলমানরা তাকে মাটিচাপা দিয়ে রাখবে। উদ্দেশ্য থাকবে, তার মরদেহের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা। কারণ, নবীজি ﷺ বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের যারা মারা গেছে, তাদের মৃতদেহ একটি কুয়োয় নিয়ে ফেলেছিলেন।

গোসলের পদ্ধতি

মৃতকে গোসল দেওয়ার সময় এক টুকরো কাপড় বা এ ধরনের কিছু দিয়ে তার লজ্জাস্থান ঢেকে নেবে। আর তার দেহ থেকে কাপড় খুলে নেবে। এরপর তার মাথা ও পিঠ উঁচু করে বসার মত করবে এবং তার পেটে চাপ দেবে, তার ভিতরে কোনো ময়লা থাকলে যেন বেরিয়ে যায়। এরপর প্রচুর পানি ঢালবে, যেন দেহ থেকে বেরোনো ময়লা দূর হয়ে যায়।

এরপর গোসলদাতা তার হাতে একটি কাপড়ের টুকরো পেঁচিয়ে নেবে। তা দিয়ে মৃতের লজ্জাস্থান ধুবে। তবে সেদিকে তাকাবে না বা সরাসরি স্পর্শও করবে না। এরপর বিসমিল্লাহ বলে তাকে সালাতের অযুর মত অযু করাবে। তবে নাকে বা মুখে পানি দেবে না। বরং একটি ভেজা নেকড়া আঙুলে পেঁচিয়ে তা মৃতের উভয় ঠোঁটের ফাঁকে ঢুকিয়ে দাঁত মাসেহ করে দেবে, এবং নাকের ফাঁকে আঙুল দিয়ে তা পরিষ্কার করে দেবে। কুলের পাতা সেদ্ধ পানি দিয়ে তার মাথা, দাড়ি ও বাকি দেহ ধুয়ে দেবে।

এরপর তার ডানদিকের সামনের ও পিছনের অংশ ধুবে। তদ্রূপ বামদিকের অংশও। প্রয়োজন হলে তিন বারেরও বেশি পানি দেওয়া যাবে।

শেষবারের ধোয়ার পানিতে কাফুর মিশ্রিত করে নেওয়া সুন্নাত। এটা ঠান্ডা ধরনের একটি সুগন্ধ। এর ঘ্রাণের কারণে পোকামাকড় আসতে পারে না। অথবা অন্য কোনো সুগন্ধ মিলিয়ে নেবে।

ঠান্ডা পানি দ্বারা মৃতকে গোসল দেওয়া মুস্তাহাব। তবে ময়লা ইত্যাদি দূর করার প্রয়োজনে গরম পানিও ব্যবহার করা যাবে। ময়লা দূর করার জন্য তদ্রূপ সাবানও ব্যবহার করা যাবে। তবে মোলায়েমভাবে মলবে।

মৃতের গোঁফ কেটে দেবে। এটা মুস্তাহাব। তদ্রূপ বগলের নীচের পশমও, যদি এগুলো লম্বা হয়। আর নখও কেটে দেবে। মেয়েদের চুল তিন ভাগে ভাগ করে পিঠের পিছনে ছেড়ে দেবে।

গোসল দেওয়ার পর মৃতের দেহ মুছে নেওয়া মুস্তাহাব।

যদি মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে পেশাব, পায়খানা বা রক্ত বেরতে থাকে এবং বারবার ধোয়ার পরও তা বন্ধ না হয়, তা হলে বেরবার স্থান তুলো দিয়ে বন্ধ করে দেবে। এরপর মৃতকে ধুয়ে নেবে। আর যদি কাফন পরানোর পর বের হয়, তা হলে তাকে আর ধুবে না। কারণ, এটি একটি কষ্টসাধ্য কাজ। তবে বের হওয়ার জায়গা ধুয়ে নেবে, এবং কাফনে যা লেগেছে তা পরিষ্কার করে নেবে।

হজ্জ বা উমরা আদায়কারী ইহরামরত অবস্থায় মারা গেলে তাকে গোসল দেবে। কিন্তু সুগন্ধ লাগাবে না। তদ্রূপ তার মাথাও ঢাকবে না। কারণ, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পড়তে পড়তে উঠবে। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

যুদ্ধময়দানে যে শহিদ হয়েছে, তাকে গোসল দেবে না। কারণ, উহুদের যুদ্ধে যেসব মুসলমান শহিদ হয়েছেন, নবীজি ﷺ তাদেরকে তাদের পোশাকেই দাফন করার আদেশ দিয়েছেন এবং গোসল না করানোর নির্দেশ দিয়েছেন। [সহিহ বুখারি]

আর তার জানাযাও পড়বে না।[৩৬] কারণ, নবীজি ﷺ উহুদের শহিদদের জানাযার সালাত পড়েননি। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

অসম্পূর্ণ সন্তান, যে কিনা পূর্ণতা পাওয়ার আগেই গর্ভ থেকে বেরিয়ে গেছে, মায়ের পেটে যদি তার চার মাস পূর্ণ হয়ে থাকে, তা হলে তাকে গোসল দেবে, জানাযা পড়বে এবং তার একটা নামও রাখবে। কারণ, হাদিসে আছে, 'তোমাদের প্রত্যেকে মায়ের পেটে বীর্য অবস্থায় থাকে, এরপর এই পরিমাণ সময় জমাটবদ্ধ রক্ত হয়ে থাকে,

---

৩৬. হানাফী আলেমদের মতে, শহিদের জানাযার সালাত পড়তে হবে।

এরপর এই পরিমাণ সময় মাংসপিণ্ড অবস্থায় থাকে। এরপর একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। সে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়।' [সহিহ মুসলিম] অর্থাৎ চার মাস পর। আর এর আগে তা এক টুকরো মাংসের মত থাকে। গোসল বা জানাযা ছাড়াই কোথাও পুঁতে রাখবে।

যাকে গোসল দেওয়া সম্ভব নয়, পানি না থাকার কারণে হোক, বা তার দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কারণে হোক বা পুড়ে যাওয়ার কারণে হোক, তাকে তায়াম্মুম করাবে। যিনি তায়াম্মুম করাবেন, তিনি মাটিতে নিজের হাত মেরে তা দিয়ে মৃতের মুখমণ্ডল ও দু' হাত মাসেহ করে দেবেন।

চার. কাফনের আহকাম

পুরুষকে তিনটি সাদা কাফন পরাবে। কারণ, নবীজি ﷺ-কে তিনটি সাদা কাফন পরানো হয়েছিল। লোবান বা ধুপের সুগন্ধ লাগাবে। এরপর একটিকে আরেকটির ওপর বিছাবে। আর দুটোর মাঝখানে সুগন্ধ দেবে। এরপর মৃতকে কাফনের ওপর চিৎ করে রাখবে। এক টুকরো কাপড় দিয়ে তার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখবে। তার নিতম্বের নীচে সুগন্ধযুক্ত তুলা রাখবে, যেন কোনো দুর্গন্ধ বের না হয়। আর যদি একটি নেকড়ার ওপর তুলা রেখে মৃতের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা হয় এবং তার উভয় লজ্জাস্থান পেঁচিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে আরও ভাল।

মৃতের উভয় চোখে, নাকে, উভয় ঠোঁটে ও কানে সুগন্ধ দেওয়া মুস্তাহাব। আর যদি পুরো দেহে দেওয়া যায়, তা হলে আরও ভাল।

কাফন পেঁচানোর সময় সবার আগে প্রথম কাপড়টির একদিক মৃতের ডান পাশে পেঁচাবে। এরপর অপর দিকটি বাম পাশে। এভাবেই দ্বিতীয়টি পেঁচাবে। তৃতীয়টিও এভাবে পেঁচাবে।[৩৭] আর যে কাপড়ের টুকরো দিয়ে তার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা হয়েছিল, তা টেনে বের করে নেবে। এরপর কাফনের ওপর সাতটি গিঁট দেওয়া হবে। আর কবরে

---

[৩৭] হানাফী আলেমদের মতে কাপড় কাটা ও পরানোর নিয়মে কিছুটা ভিন্নতা আছে।

নামানোর পর সেগুলো খুলে ফেলবে। গিঁট সাতটার কম হলেও জায়েয হবে।

মেয়েদেরকে পাঁচ কাপড়ে কাফন পরাবে-ইজার, যা তার দেহের নীচের দিক ঢেকে রাখবে; খিমার, যা তার মাথা ঢেকে রাখবে; কামিস [এটি পোশাকের মত, তবে দু' পাশ খোলা থাকবে]; আর দুটি লেফাফা, যা পুরো দেহ ঢেকে রাখবে। [আর যদি পুরুষদের মত কাফন পরানো হয়, তা হলেও জায়েয হবে।]

পাঁচ. জানাযার সালাত পড়ার আহকাম

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হয়ে তার ওপর সালাত পড়ে, সে এক কিরাত পাবে। আর যে দাফন পর্যন্ত থাকবে, সে দু' কিরাত পাবে।' জিজ্ঞাসা করা হল, ' দু' কিরাত কী পরিমাণ?' তিনি বললেন, ' দুটি বিশাল পাহাড়ের মত। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

জানাযার সালাত ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ মুসলমানদের কয়েকজন তা পড়ে নিলেই সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

জানাযার সালাতে চার তাকবির। প্রথম তাকবিরের পর আউযুবিল্লাহ পড়ে সূরায়ে ফাতিহা পড়বে।[৩৮] দ্বিতীয় তাকবিরের পর নবীজি ﷺ-র ওপর দরূদ শরিফ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

আর তৃতীয় তাকবিরের পর মৃতের জন্য দোয়া করবে। যেমন[৩৯]–

---

[৩৮] হানাফী আলেমদের মতে, প্রথম তাকবিরের পর সানা পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَه وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَنَقِّه مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خيرًا مِّنْ دَارِه، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِه، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ [সহিহ মুসলিম]

আর যদি ছোট শিশু হয়, তা হলে তার ও তার পিতামাতার জন্য দোয়া করবে।

চতুর্থ তাকবিরের পর খানিক চুপ থেকে ডান দিকে সালাম ফেরাবে। যদি বাম দিকেও সালাম ফেরায়, তা হলেও জায়েয আছে। আর প্রত্যেক তাকবিরের সময় হাত উঠাবে।[৪০]

কেউ যদি জানাযার সালাতে শরিক হতে না পারে, তা হলে দাফনের পরও পড়তে পারবে।[৪১]

কবরকে তার ও ক্বিবলার মাঝে রেখে জানাযার মত পড়বে। কারণ, নবীজি ﷺ এমনটা করেছেন।

কেউ যদি সালাতের মধ্যখানে শরিক হয়, তা হলে ইমাম সালাম ফেরানোর পর বাদ-যাওয়া সালাত নিয়মমত পড়ে নেবে। আর যদি সালাত শেষ করার আগেই জানাযা উঠিয়ে নেওয়ার ভয় করে, তা হলে তাকবিরগুলো পর পর বলে সালাম ফেরাবে।

ছয়. জানাযা বহন ও দাফন

জানাযা নিয়ে দ্রুত যাওয়া সুন্নাত। তবে যাবে কোমলভাবে। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

---

৩৯. রাসুল ﷺ থেকে অন্য দোয়াও বর্ণিত আছে।

৪০. হানাফী আলেমদের মতে শুধু প্রথম তাকবিরে হাত উঠাবে।

৪১. হানাফী আলেমদের মতে, এক বার জানাযার সালাত হয়ে যাওয়ার পর আর কারও জন্য তা পড়ার অনুমতি থাকে না।

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

জানাযা নিয়ে দ্রুত যেয়ো। তার আমল যদি ভাল হয়, তা হলে তাকে তার ভাল আমলের দিকে এগিয়ে দিচ্ছ। আর যদি অন্যকিছু হয়, তা হলে একটি মন্দ তোমার কাঁধ থেকে ফেলে দিচ্ছ। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

জানাযা বহনকারী ও সঙ্গে গমনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে স্থিরতা ও নীরবতা থাকবে। উঁচু আওয়াজে কিরাআত বা যিকির করবে না।

জানাযার আগে বা পরে, ডানে বা বাঁয়ে চলা জায়েয। জানাযার পিছু গমনকারী ব্যক্তিদের জন্য জানাযা মাটিতে রাখার আগে বসা মাকরূহ। নবীজি ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

তিনটি সময় এমন আছে, যখন মৃতকে দাফন করতে নিষেধ করা হয়েছে। একটি হল সূর্যোদয়ের সময়। সূর্য উঠে যাওয়ার পর দাফন করা যাবে। দ্বিতীয়টি হল ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়। যোহরের সালাতের সময় শুরু হওয়ার পূর্বে মোটামুটি দশ মিনিট সময়। আর তৃতীয়টি হল সূর্যাস্তের সময়। উক্বা বিন আমের রাযি. বর্ণনা করেন–

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

তিন সময় সালাত পড়তে এবং মৃতদের দাফন করতে নবীজি ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়, যে পর্যন্ত না তা পুরোপুরি উদয় হয়। ঠিক দ্বিপ্রহরে, ঢলে যাওয়া পর্যন্ত। এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়। [সহিহ মুসলিম]

রাতে দাফন করা জায়েয আছে।

মৃতকে তার পায়ের দিক থেকে কবরে প্রবেশ করানো সুন্নাত। তা সম্ভব না হলে ক্বিবলার দিক থেকে প্রবেশ করাবে। আর যারা মৃতকে কবরে প্রবেশ করাবে, তারা বলবে–

[সুনানে আবু দাউদ] بِسْمِ اللهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

কবর 'শাক্ক' করা থেকে 'লাহদ' করা উত্তম। নবীজি ﷺ বলেছেন–

اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

লাহদ হল আমাদের জন্য; আর শাক্ক হল অন্যদের জন্য। [সুনানে আবু দাউদ]

লাহদ হল কবরের ভিতর ক্বিবলার দিকে মাটি কেটে গর্ত করা, যেখানে মৃতকে রাখা যাবে। আর শাক্ক হল কবরের নীচে মাঝখানে গর্ত করা।

কবর গভীর করা সুন্নাত। এতে হিংস্র প্রাণী থেকে মৃতদেহ নিরাপদ থাকবে, এবং তার থেকে গন্ধ ছড়াবে না।

মৃতকে তার ডান পাশের ওপর ক্বিবলার দিকে ফিরিয়ে রাখা সুন্নাত।

কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা সুন্নাত। এতে বোঝা যাবে, এটা কবর। ফলে এর অসম্মান হবে না। আর উঁচু করবে উটের কুঁজের মত। আর চেনার জন্য কবরের মাথার দিকে একটি পাথর রেখে দেবে, যেমন উসমান বিন মাযউন رضي الله عنه-র কবরে নবীজি ﷺ করেছিলেন। [সুনানে আবু দাউদ]

কবরে ইমারত বানানো এবং তাতে কিছু লেখা হারাম। কবরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বা জুতা মাড়িয়ে যাওয়া বা তার ওপর বসা, কবরকে অসম্মান করারই নামান্তর। তাই এগুলোও হারাম। মুসলিমের এক রেওয়ায়াতে আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

কবরের ওপর বসা থেকে অঙ্গারের ওপর বসা, যা কিনা তার কাপড় পুড়ে তার দেহ পর্যন্ত পৌঁছবে, অনেক উত্তম।

নিয়ম হল, প্রত্যেক মৃতকে আলাদা আলাদা কবর দেওয়া। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একই কবরে দু'জন-তিনজন করেও দাফন করা

জায়েয আছে। যেমন মৃতের সংখ্যা অনেক এবং দাফনকারীর সংখ্যা কম। উহুদের শহিদদের ক্ষেত্রে এরূপই করা হয়েছে। তবে দুজনের মধ্যে মাটি দিয়ে ব্যবধান রাখবে।

দাফনশেষে কবরের নিকট দাঁড়িয়ে মৃতের জন্য দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা মুস্তাহাব। কারণ, নবীজি ﷺ দাফন শেষ করে মৃতের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন–

اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ

> তোমরা তোমাদের ভায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। সে যেন অটল থাকে, তার জন্য দোয়া করো। কারণ, এখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। [সুনানে আবু দাউদ]

তবে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়া বিদআত। কারণ, নবীজি ﷺ বা সাহাবায়ে কিরাম এরূপ করেননি।

কবরকে আলোকসজ্জিত করা হারাম। বিদ্যুতের বাতি বা অন্য কোনো বাতি দ্বারা কবর আলোকিত করা যাবে না। তদ্রূপ কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা বা তাতে সালাত পড়া হারাম।

সাত. শোক প্রকাশ ও কবর যিয়ারত

যে ব্যক্তির কেউ মারা গেছে, তার নিকট শোক প্রকাশ করা এবং তাকে ধৈর্য ধারণ করতে ও মৃতের জন্য দোয়া করতে উদ্বুদ্ধ করা সুন্নাত। হাদিস শরিফে বলা হয়েছে–

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

> যে মুমিন ব্যক্তি তার ভায়ের বিপদে তাকে সান্ত¡না দেয়, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন। [হাসান সনদে ইবনে মাজা বর্ণিত]

এ বলে তাকে সান্ত্বনা দেবে যে, আল্লাহ ﷻ যা গ্রহণ করেছেন, তা তারই, আর যা দান করেন, তা-ও তার। আল্লাহ ﷻ-র দরবারে প্রত্যেক বস্তুরই একটি সময় নির্ধারিত আছে। কাজেই ধৈর্য ধারণ করো

এবং আল্লাহ ﷻ-র নিকট সওয়াবের আশা রাখো। অথবা বলবে, আল্লাহ ﷻ তোমাকে বিরাট সওয়াব দান করুন, তোমাকে উত্তম সান্ত্বনা প্রদান করুন এবং তোমার মৃতকে ক্ষমা করুন।

কেউ মারা গেলে সামান্য কান্না করা যেতে পারে। তবে কোনোরূপ বিলাপ বা চিৎকার করবে না। কারণ, নবীজি ﷺ-র পুত্র ইবরাহিম মারা গেলে তার চোখ থেকে অশ্রু বেয়ে পড়েছিল।

মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করা যাবে। মৃতের কারণে দুঃখিত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না, সেজেগুজে বের হবে না, ইত্যাদি। এটা মাত্র তিন দিন করা যাবে। তবে স্ত্রী তার পুরো ইদ্দতে স্বামীর জন্য শোক পালন করবে। অর্থাৎ চার মাস দশ দিন, যদি গর্ভবতী না হয়। আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত শোক পালন করবে।

শোক পালনের জন্য কোনো অনুষ্ঠান বা ঘোষণা করা যাবে না, যেমনটা আজকাল অনেকেই করে থাকে।

মৃতের পরিবারের লোকদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা মুস্তাহাব। নবীজি ﷺ বলেছিলেন–

> اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ
>
> জাফরের পরিবারের লোকদের জন্য খাবারের আয়োজন করো। কারণ, বিপদের ফলে তারা এদিকে মনোযোগ দিতে পারছে না। [মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযি]

অনেকখানে দেখা যায়, কেউ মারা গেলে লোকদের সমবেত হওয়ার জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করে রাখে, খাবারের আয়োজন করে, কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য লোক ভাড়া করে আনে, এর পিছনে অনেক অর্থ ব্যয় করে। এগুলো নবআবিষ্কৃত হারাম কাজ। জারির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه বলেন, ' মৃতের পরিবারের নিকট সমবেত হওয়া এবং দাফনের পর সেখানে খাবারের আয়োজন করাকে আমরা বিলাপ বলে গণ্য করতাম।'

শিক্ষা নেওয়ার জন্য কবর যিয়ারত করা পুরুষদের জন্য সুন্নাত। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত করো। কারণ, এটি তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। [সহিহ মুসলিম]

কবর যিয়ারতকারী এ দোয়া পড়বে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ. وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ

আছ-ছালামু আলাইকুম দারা কাউমিম মুমিনিন, ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লাহু বিকুম লাহিকুন

তিন শর্তে কবর যিয়ারত মুস্তাহাব

১. যিয়ারতকারী পুরুষ হতে হবে, মহিলা নয়। কারণ, কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদের নবীজি ﷺ লানত করেছেন। [সুনানে ইবনে মাজা, তিরমিযি]

২. সফর করা যাবে না। কারণ, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا تُشدُّ الرِّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد : مَسْجِد الْحَرَام ، وَمَسْجِد الرَّسُول ، وَمَسْجِد الْأَقْصَى

তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

৩. যিয়ারত দ্বারা উদ্দেশ্য হতে হবে শিক্ষাগ্রহণ ও মৃতের জন্য দোয়া। বরকতের জন্য যিয়ারত করা বা প্রয়োজন পূরণের জন্য যিয়ারত করা-এসব হারাম ও শিরকি কাজ।

মৃত্যুর বিছানায়

বিশিষ্ট আবেদ ও জাহেদ আব্দুল্লাহ বিন ইদরিস ﷺ-র মৃত্যুর সময় তার যন্ত্রণা বেড়ে গিয়েছিল। তিনি যখন দ্রুত শ্বাস নিতে লাগলেন, তা দেখে তার মেয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'বেটি, কোঁদো না! এ ঘরেই আমি চার হাজার বার কুরআন খতম করেছি। সবক' টা খতমই করেছি এই পরিস্থিতির জন্য।'

আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর। মৃত্যুশয্যায় শায়িত। শেষ ক' টি শ্বাস গণনা করছেন। পাশে বসে পরিবারের লোকজন কাঁদছে। মৃত্যুর ওপারে যাওয়ার উপক্রম করছেন এমন সময় তিনি আযান শুনতে পেলেন। মাগরিবের আযান দিয়েছেন মুআয্যিন। পাশে উপবিষ্ট লোকদের তিনি বললেন, 'আমার দু' হাত ধরো।' তারা বললেন, 'কোথায় যাবেন?' তিনি বললেন, 'মসজিদে।' তারা বললেন, 'এই অবস্থায়!' তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! সালাতের ডাক শুনতে পাব, আর তাতে সাড়া দেব না? আমার হাত ধরো!' তারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। ইমামের সাথে এক রাকআত পড়লেন। এরপর সেজদার মধ্যেই বিদায় হলেন। হ্যাঁ! সেজদারত অবস্থায়ই তার মৃত্যু হল।

আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদের মৃত্যুক্ষণ। তিনি কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করা হল, 'কান্নার কারণ কী? আপনি ... । আপনি ... ।' অর্থাৎ সালাত-ইবাদত-বিনয়-যুহদে তো আপনি অনন্য। তিনি বললেন, 'খোদার কসম! আমি আমার সালাত-সিয়ামের ওপর আক্ষেপ করে কাঁদছি। এরপর তিনি তেলাওয়াত করতে লাগলেন। আর এই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হল।'

ইয়াজিদ রাক্কাশি তার মৃত্যুর সময় এ বলে কাঁদতে লাগলেন, ' ইয়াজিদ! তুমি মারা গেলে তোমার জন্য সালাত পড়বে কে? তোমার জন্য সিয়াম রাখবে কে? কে তোমার গোনাহ মাফের দরখাস্ত করবে? এরপর তিনি কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন।'

যাকাতের আহকাম

যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন—

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ﴾

> তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো। [সূরা বাকারা : আয়াত : ১১০]

দ্বিতীয় হিজরিতে যাকাত ফরজ হয়।

বুখারির হাদিসে আছে, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

> যাকে আল্লাহ তাআলা মাল দিয়েছেন, আর সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার মালকে একটি টেকো সাপের আকৃতি দেওয়া হবে, যার চোখের ওপর দুটি ফোঁটা থাকবে, এবং সেটাকে তার গলায় বেড়ির মত পরিয়ে দেওয়া হবে। সেটা তার মুখের দু' চোয়ালে অর্থাৎ দু' গালে দংশন করবে; বলবে, ' আমি তোমার মাল। আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ' । এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন—

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

যারা কার্পণ্য করে ওই ধন-সম্পদ নিয়ে, যা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের দান করেছেন, তারা যেন এই ধারণা না করে যে, সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং সেটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যে ধন-সম্পদ নিয়ে তারা কার্পণ্য করে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও জমিনের পরম স্বত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। [সূরা আলে ইমরান : আয়াত : ১৮০]

মুসলিমের এক রেওয়ায়াতে আছে, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

যে ব্যক্তির উট, গরু বা মেষ আছে, আর সে সেগুলোর হক আদায় করে না, কিয়ামতের দিন সেগুলোর জন্য তাকে একটি নিম্নভূমিতে দাঁড় করানো হবে। এরপর খুরবিশিষ্ট পশু তাকে খুর দিয়ে মাড়াবে, শিঙবিশিষ্ট পশু তাকে শিঙ দিয়ে আঘাত করবে। সেদিন কোনো পশু শিঙ-ছাড়া বা শিঙভাঙ্গা থাকবে না।' বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ' হে আল্লাহর রাসুল! সেগুলোর হক কী?' তিনি বললেন, ' ... আর যে ব্যক্তিই মালের যাকাত আদায় করবে না, ওই মাল কিয়ামতের দিন টেকো সাপের আকৃতি ধারণ করে তাকে তাড়া করতে থাকবে এবং সে পলায়ন করতে থাকবে। বলা হবে, এই তো সেই মাল, যার যাকাত তুমি কার্পণ্যবশত দাওনি। যখন দেখবে, ওই সাপ থেকে নিস্তার পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সে ওই সাপের মুখে হাত ঢুকিয়ে দেবে। সাপ তার হাত কামড়াতে থাকবে, যেমন উট কামড়ে থাকে।

নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো পাওয়া গেলে যাকাত ওয়াজিব হবে

১. স্বাধীনতা। কাজেই কোনো দাস-দাসীর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

২. মুসলমান হওয়া।

৩. নিসাব পরিমাণ মালের মালিকানা থাকা। নিসাবের বর্ণনা সামনে আসছে।

৪. মালিকানা পূর্ণরূপে থাকা। কাজেই যদি তার মাল কারও নিকট আবদ্ধ থাকে, বা তাতে তার কর্তৃত্ব না চলে, তা হলে যাকাত দিতে হবে না।

৫. মালের ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া। তবে জমিনের উৎপন্ন ফসলে এই শর্ত নেই। যেমন ফল, শস্যদানা ইত্যাদি। এগুলো কাটার বা সংগ্রহ করার সাথে সাথেই যাকাত দেবে।

চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত

উট, গরু বা মেষের ওপর দুটি শর্তসাপেক্ষে যাকাত ওয়াজিব হয়–

এক. দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য এবং সেগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতিপালন করা।

দুই. পুরো বছর বা বছরের বেশিরভাগ সময় মাঠে চরা। যদি পুরো বছর বা বছরের বেশিরভাগ সময় সেগুলোর খাবার সংগ্রহ করে দিতে হয়, তা হলে সেগুলোর ওপর যাকাত আসবে না।

সোনা-রুপার যাকাত

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ﴾

আর যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে, এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। [সূরা তাওবা : আয়াত : ৩৪]

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى نَارٍ

যার নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য আছে, আর সে তার হক আদায় করে না, তাদের জন্য বহু পাত প্রশস্ত করা হবে, এরপর তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, এরপর তা দিয়ে তার পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখন তা ঠান্ডা হবে, পুনরায় তা তপ্ত করা হবে। আর তা হবে এমন দিনে, যেদিনের দৈর্ঘ হল পঞ্চাশ হাজার বছর। আর তা চলবে বান্দাদের হিসাব শেষ হওয়া পর্যন্ত। এরপর সে তার পথ হয়ত জান্নাতের দিকে পাবে, অথবা জাহান্নামের দিকে। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

স্বর্ণের পরিমাণ ৮৪ গ্রাম হলে যাকাত ওয়াজিব হয়। আর রৌপ্যের পরিমাণ ৫৯৫ গ্রাম হলে যাকাত ওয়াজিব হয়।

পুরুষের জন্য রুপার আংটি ব্যবহার জায়েয। স্বর্ণের আংটি তার জন্য হারাম। আর নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য, দুটোর অলংকারই জায়েয। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

স্বর্ণ ও রেশম আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে, এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে। [মুসনাদে আহমাদ]

নারীদের স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলংকারে যাকাত নেই,[৪২] যা তারা ব্যবহারের জন্য বা ধার দেওয়ার জন্য বানিয়ে থাকে। কারণ, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

অলংকারে যাকাত নেই। [তবরানি; জাবেরের সূত্রে, তবে সনদটি দুর্বল।]

---

৪২. হানাফী আলেমদের মতে, স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলংকারেও যাকাত আছে, চাই তা ব্যবহারের জন্যই হোক না কেন।

এ কথার ওপর একদল সাহাবির ফতোয়া। যেমন আনাস, জাবের, ইবনে উমর, আয়েশা ও তার বোন আসমা ﷺ।

ইমাম আহমদ ﷺ বলেন, এ ব্যাপারে পাঁচ জন সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে। আর এর দ্বারা বৃদ্ধি উদ্দেশ্য থাকে না, বরং শুধুই ব্যবহার উদ্দেশ্য থাকে, ঠিক যেমন পোশাক বা থাকার ঘর। তবে যদি কোনো মহিলার নিকট অলংকার থাকে, আর সে তা সব সময় ব্যবহার না করে প্রয়োজনের সময় বিক্রয়ের জন্য রেখে দেয়, তা হলে তার ওপর যাকাত আসবে। কারণ, তা সঞ্চিত সম্পদ। [মাসআলাটি নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তাই যদি সতর্কতাস্বরূপ সব ধরনের অলংকার থেকে যাকাত আদায় করা হয়, তা হলে ক্ষতি নেই।]

ফায়দা : কোনো পাত্র, কলম, গাড়ি বা সেগুলোর চাবিতে স্বর্ণ বা রৌপ্যের প্রলেপ দেওয়া হারাম। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পানি পান করে, সে তার উদরে জাহান্নামের আগুন টেনে নেয়। [সহিহ ইবনে হিব্বান]

স্বর্ণ ও রৌপ্যের মতই নগদ অর্থেরও যাকাত দিতে হবে, যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়, এবং তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়। আর মালেব নিসাব কী, তা নবীজি ﷺ রৌপ্য দ্বারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বলেছেন–

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

পাঁচ আওকিয়ার কমে যাকাত নেই। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

আর পাঁচ আওকিয়া হল ৫৯৫ গ্রাম, যা ৫৯৫ রিয়ালের সমান। যদি এর সমপরিমাণ বা তার বেশি মালের মালিক হয়, এবং এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তা হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব। আর যাকাত আদায় করতে হবে শতকরা আড়াই ভাগ, বা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

মাল যখন বাড়ে-কমে, যেমনটা অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তা হলে বছরের একটি তারিখ নির্ধারণ করে রাখবে। যখনই ওই
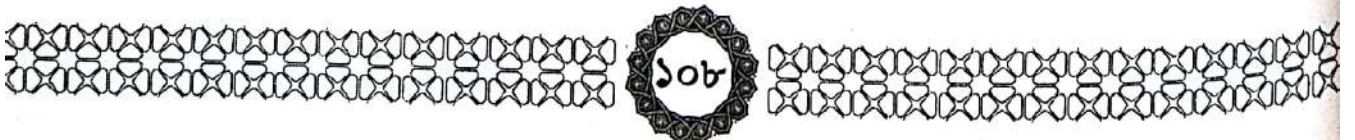
তারিখ আসবে, যে পরিমাণ মাল থাকবে, সেটার যাকাত আদায় করবে, চাই এক বছর আগে মালিক হোক, বা এক মাস আগে।

কারও নিকট যদি নিসাব পরিমাণ মাল সঞ্চয় হয়, এবং এরপর এক বছর পেরিয়ে যায়, তা হলে সে মালের যাকাত দিতে হবে, চাই সে মাল ব্যয় করার জন্য সঞ্চয় করে থাকুক, বা বিবাহ করার জন্য, বা জমি কেনার জন্য বা ঋণ[৪৩] পরিশোধের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। কারণ, এই জাতীয় সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলিলে কোনো শর্ত যুক্ত করা হয়নি।

অনেকেই যাকাত আদায়ের জন্য রামাদান মাস নির্ধারণ করে রাখেন। তবে বছরের অন্য সময়ও আদায় করা যায়। কিন্তু যেন ভুলে না যান, তাই তারা এই মাসটিকে নির্ধারণ করে নিয়েছেন। ব্যাপারটা এমন হলে ক্ষতি নেই।

কেউ যদি অন্যের নিকট পাওনা থাকে, সে মালের কি যাকাত দিতে হবে? এখানে ব্যাখ্যা আছে।

যদি ঋণগ্রহীতা এমন অভাবগ্রস্ত হয় যে, ঋণ পরিশোধ করার শক্তি তার নেই, কিংবা সে অভাবী নয়, কিন্তু ঋণ পরিশোধে তালবাহানা করছে, যার কারণে তার থেকে ঋণের অর্থ উঠানো যাচ্ছে না, তা হলে ওই মালে যাকাত আসবে না।

আর যদি ঋণের অর্থ উঠানো সম্ভব হয়, কিন্তু ঋণদাতা অলসতা করে তা উদ্ধার করছে না, তা হলে যাকাত দিতে হবে। কারণ, যেহেতু সে তা উদ্ধার করতে সক্ষম, তা হলে ধরে নেওয়া হবে, তা তারই নিকট আছে।

ইবনে উমর ﵁ বলেন, ' যে ঋণের অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, বছরশেষে সেটার যাকাত দিতে হবে।'

---

[৪৩] হানাফী আলেমদের মতে, ঋণ পরিশোধের জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন, ততটুকু অর্থের উপর যাকাত আসবে না।

ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত

ব্যবসায়ী পণ্য বলতে সেটাকেই বোঝায়, যা বেচাকেনা করে লাভ করা উদ্দেশ্য থাকে। আরবিতে এটিকে عُرُوْضُ বলা হয়। عُرُوْضُ শব্দের মূল অর্থ হল পেশ করা। যেহেতু বেচাকেনার সময় পণ্য পেশ করা হয়, তাই আরবিতে এটিকে عُرُوْضُ বলা হয়। সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

يَأْمُرُنَا؛ أَنْ نُخْرِجَ اَلزَّكَاةَ مِمَّا نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ

> নবীজি ﷺ আমাদেরকে আমাদের ব্যবসার মাল থেকে যাকাত দিতে নির্দেশ দিতেন। [সুনানে আবু দাউদ]

কাজেই এমন পণ্যের ওপর যদি এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তা হলে সেটার যাকাত দিতে হবে। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> এক বছর অতিক্রান্ত না হলে মালে যাকাত নেই। [সুনানে ইবনে মাজা]

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

বছরশেষে হিসাব করবে, তার নিকট যে পণ্য আছে, সেগুলো বিক্রয় করলে কত পাওয়া যাবে। ওই পরিমাণ মূল্যের যাকাত আদায় করবে। যেমন, কারও দোকানে কিছু পণ্য আছে [সে-পণ্য খাদ্য, বস্ত্র, গাড়ি, আসবাবপত্র, যা-ই হোক], আর সেগুলোর ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। দেখতে হবে, এখন এগুলোর বাজারমূল্য কত। ওই মূল্যের যাকাত আদায় করতে হবে। যদি মূল্য এক হাজার রিয়াল হয়, তা হলে শতকরা আড়াই ভাগ হারে পঁচিশ রিয়াল যাকাত আদায় করবে।

বছরের মধ্যখানে যা বৃদ্ধি পাবে, মূলধনের বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সেটারও বছর পূর্ণ হয়েছে বলে ধরে নেবে।

উদাহরণ- ১

বছরের শুরুতে কেউ দোকান খুলল, এবং সেখানে এক হাজার রিয়ালের পণ্য রাখল। পুরো বছর বেচাকেনা করল। বছরশেষে দেখল,
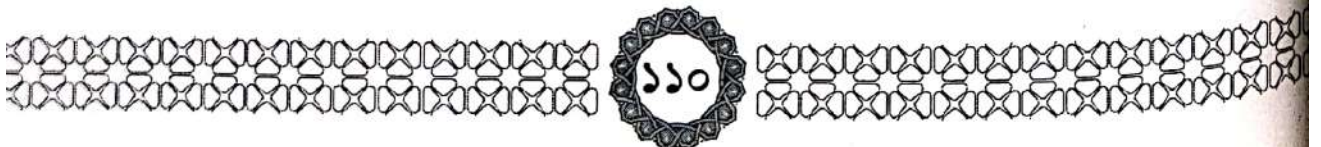
দোকানে যা আছে, সেগুলোর মূল্য হল পনেরো শ' রিয়াল। এখন পনেরো শ' রিয়ালের যাকাত আদায় করবে।

উদাহরণ- ২

একব্যক্তির ঔষধের দোকান আছে। বছর শেষ হলে যাকাত আদায় করতে হবে। যাকাত আদায়ের সময় সেগুলোর বর্তমান মূল্য ধরে নিয়ে যাকাত আদায় করবে, ক্রয়মূল্য ধরে নয়।

যেসব বস্তু বিক্রয়ের জন্য নয়, সেগুলোর যাকাত দিতে হবে না। যেমন দোকানের জিনিসপত্র, টেলিফোন, ফ্রিজ, গাড়ি, রুটি বানানোর উপকরণ। এগুলোর যাকাত দিতে হবে না। ব্যবসায়ী তার বিক্রয়ের পণ্যগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে সেগুলোর ওপর শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত আদায় করবে। পণ্যের যাকাত পণ্য থেকে দেবে না। বরং সেটার মূল্য ধরে নেবে। কারণ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে মূল্য। তবে যদি পণ্য দিয়েই যাকাত আদায় করে, এবং যাকে যাকাত দেবে, তারও এটার দরকার হয়, তা হলে জায়েয হবে।

জমিজমা, বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদিতে যাকাত নেই। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখলে যাকাত দিতে হবে। যদি সংগ্রহ বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রাখা হয়, তা হলে যাকাত দিতে হবে না। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ

মুসলমানের গোলাম বা ঘোড়ায় যাকাত নেই। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

তবে জমিন, বাড়ি বা গাড়ি যদি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা হয়, তা হলে বছর পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে। আর বছর শুরু হবে তখন থেকে, যখন এগুলো বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কারও কোনো জমিন আছে, আর সে তা বিক্রয়ের চিন্তাভাবনা করছে, কিন্তু বিক্রয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। এরূপ ক্ষেত্রে যাকাত দিতে হবে না।

তদ্রূপ কেউ কোনো জমিন কিনল। আর দীর্ঘ দিন পর বিক্রয় করারও ইচ্ছা আছে। কিন্তু এখনই বিক্রয় করছে না, বা বিক্রয় করার প্রস্তাব

দেয়নি, বা সেটা দামাদামিও করা হয়নি। তা হলে যাকাত দিতে হবে না। যখন বিক্রয়ের প্রস্তাব দেবে, তখনই যাকাত দেবে।

কারও ওপর যাকাত ওয়াজিব হল। কিন্তু যাকাত আদায়ের আগেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। তা হলে তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে যাকাত আদায় করতে হবে। মৃত্যুর কারণে যাকাত রহিত হয়ে যাবে না।

যেসব প্রাসাদ বা ঘরবাড়ি কিংবা জায়গাজমিন ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়, সেগুলোর ভাড়ার ওপর বছর পেরিয়ে গেলে যাকাত দিতে হবে, সেই ঘরবাড়ি বা জায়গাজমির যাকাত দিতে হবে না। তদ্রূপ প্রাইভেট গাড়ি ও টেক্সির মূল্যের ওপর যাকাত আসবে না, যদি সেগুলো বিক্রয়ের জন্য না হয়, বরং নিজের ব্যবহারের জন্য হয়।

সাত হাজার দেরহাম ...
জেল হতে খালাস!!

ঘটনাটি তারিখে বাগদাদ কিতাবে বর্ণিত আছে। এক দরিদ্র ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﵀-র নিকট এল। জানাল, সে ঋণগ্রস্ত। অনুরোধ করল, তিনি যেন ঋণটা আদায় করে দেন। একটি চিঠি লিখে তিনি তার হাতে দিলেন এবং তাকে তার মুনশির নিকট যেতে বললেন। লোকটি চিঠিটি নিয়ে তার নিকট গেল। মুনশি চিঠিটি পড়ল। এরপর ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল, ' কত টাকা ঋণ আদায়ের কথা তুমি তাকে বলেছিলে?' সে বলল, ' সাতশ' দেরহাম।' মুনশি তার নিকট একটি চিঠি লিখল, ' লোকটা আপনার নিকট সাতশ' দেরহামের
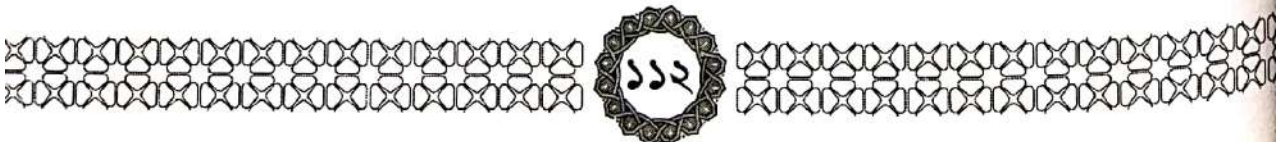
কথা বলেছে। আর আপনি সাত হাজার দেরহামের কথা লিখেছেন। এভাবে অল্পদিনেই সব মাল শেষ হয়ে যাবে।'

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷬ লিখে পাঠালেন, 'মাল যদি শেষ হয়ে যায়, তা হলে জীবনও তো শেষ হয়ে যাবে। কাজেই আমার কলম যা লিখেছে, তা-ই আদায় করো।'

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷬ প্রায়ই রিক্কা যেতেন। একটি সরাইখানায় অবস্থান করতেন। এক যুবক এসে তার সেবা করত। তার প্রয়োজন মেটাত। তার থেকে হাদিস শুনত।

একবার তিনি রিক্কায় এলেন। কিন্তু যুবকটিকে দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, সে বন্দী। অনেক ঋণী হয়ে পড়েছে সে। তাই তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঋণের পরিমাণ কত?' লোকেরা জানাল, 'দশ হাজার দেরহাম।' আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷬ পাওনাদারকে খোঁজ করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে একসময় তাকে পেয়েও গেলেন। তিনি রাতে তাকে ডেকে আনলেন। দশ হাজার দেরহাম তাকে দিয়ে বললেন, 'সে যেন এটা কাউকে না জানায়, যত দিন তিনি বেঁচে থাকেন।' আর বললেন, 'ভোর হলে তাকে মুক্ত করে দেবে।' এরপর আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রাতেই রিক্কা ত্যাগ করলেন।

যুবকটি কয়েদখানা থেকে মুক্ত হলে তাকে জানানো হল, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক এসেছিলেন। তোমার খোঁজ করেছিলেন। যুবক তার পিছনে পিছনে ছুটল। রিক্কা হতে দু'-তিন মনযিল দূরে গিয়ে তার সাক্ষাৎ পেল। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুবক! কোথায় ছিলে? সরাইখানায় দেখিনি।' যুবক বলল, 'ঋণের কারণে কয়েদ ছিলাম।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুক্তি পেলে কীভাবে?' সে বলল, 'একব্যক্তি এসে ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে। তাকে চিনতে পারিনি।' আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷬ বললেন, 'আল্লাহ যে তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তার জন্য তার শোকর করো।' এরপর তিনি তার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

সদকাতুল ফিতর

সদকাতুল ফিতর হল সে সদকা, ঈদুল ফিতরের সালাতের আগে বা ঈদের এক-দু' দিন আগে যা দান করা হয়।

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ﴾

সফলকাম সে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করে, এবং তার প্রভুর নাম নেয়, অতঃপর সালাত আদায় করে। [সূরা আলা: আয়াত: ১৪-১৫]

আর রাসুল ﷺ সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করে দিয়েছেন-এক ছা' গম বা যব, মুসলমান গোলাম ও আজাদ ব্যক্তির ওপর, পুরুষ ও নারীর ওপর এবং ছোট ও বড়োর ওপর।

ছা'-এর পরিমাণ

এক ছা' হল দু' কেজি চারশ' গ্রামের সমপরিমাণ। শহরের মধ্যে যে খাবারের প্রচলন বেশি সেটা দেবে, চাই তা চাল হোক, গম হোক, যব হোক বা ভুট্টা হোক।

আদায়ের সময়

সদকায়ে ফিতর আদায়ের প্রকৃত সময় শুরু হয় ঈদের রাত শুরু হলে [রামাদানের শেষদিনের সূর্যাস্ত হওয়ার সাথে সাথে]। ঈদের দু'-এক দিন আগে দিলেও জায়েয হবে। তবে ঈদের দিন ঈদের সালাতের আগে আদায় করা উত্তম। ঈদের সালাতের পর বিলম্ব করা জায়েয হবে না।

সদকায়ে ফিতর নিজের পক্ষ থেকে এবং স্ত্রী-সন্তানসহ যাদের ভরণপোষণ করতে হয়, তাদের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, যাদের ভরণপোষণ কর, তাদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করো।

গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষ থেকেও যদি আদায় করা হয়, তা হলে ভাল, যেমনটা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন।

যাদের পক্ষ থেকে আদায় করা জরুরি নয়, তাদের পক্ষ থেকেও যদি আদায় করা হয়, তা হলে জায়েয হবে। যেমন চাকর, ড্রাইভার।

সদকায়ে ফিতর হিসেবে খাদ্যদ্রব্য দেওয়াই সুন্নাত, যেমনটা নবীজি ﷺ নিয়ম করে দিয়েছিলেন। যদি সেটার মূল্য দেওয়া হয়, তা হলে তা সুন্নাতপরিপন্থী হবে। নবীজি ﷺ বা সাহাবিদের কেউ তা করেননি। কোনো কোনো আলেমের মতে, দরিদ্র ব্যক্তি যদি তার মুখাপেক্ষী হয়, তা হলে তাকে খাদ্যদ্রব্য না দিয়ে সেটার মূল্য দেওয়া জায়েয।

যাকাতের খাত

মালিকানাধীন সব ধরনের মালেই যাকাত ওয়াজিব হয়। এমনকি, যদি পিতৃহীন শিশুর বা পাগলের মাল থাকে, তা হলে তাদের অভিভাবক তাদের মাল থেকেও যাকাত আদায় করবে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করো। এতে তুমি তাদেরকে পাক-পবিত্র করবে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া করো। নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনার কারণ। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন। [সূরা তাওবা : আয়াত : ১০৩]

অর্থাৎ তাদের জন্য দোয়া করো।

আর যে মালের নির্দিষ্ট কোনো মালিক নেই, যেমন মসজিদ নির্মাণের জন্য সংগৃহীত সম্পদ, বা জনকল্যাণমূলক কোনো রাস্তা বানানোর

জন্য সংগৃহীত সম্পদ, এগুলোয় যাকাত নেই, চাই তা যে পরিমাণই হোক বা তার ওপর বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাক।

দরিদ্রকে যাকাত দেওয়ার সময় তাকে জানানোর দরকার নেই যে, এটা যাকাত। কারণ, এতে তার কষ্ট হবে। তবে যদি এমন কাউকে দেওয়া হয়, যার দরিদ্র হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে, তা হলে জানিয়ে দেবে যে, এটা যাকাত। তা হলে সে যাকাতের হকদার হলে তা গ্রহণ করবে, আর না হলে করবে না, কিংবা তা অন্য হকদারকে দিয়ে দেবে।

মাল যে শহরের, মালের যাকাতও সে-শহরেই আদায় করা উত্তম। সেখানকার দরিদ্রদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেবে। তবে শর'য়ি কোনো উপকারিতার কারণে যদি অন্যত্র দেওয়া হয়, তা হলেও জায়েয হবে। যেমন নিজের কোনো আত্মীয় অন্য কোনো শহরে বসবাস করে।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার আগেই তা আদায় করা জায়েয। কারণ, নবীজি ﷺ আব্বাস رضي الله عنه-র দু' বছরের সদকা একসাথে আদায় করে দিয়েছেন।

তাই যদি কোনো দরিদ্র ও অভাবী ব্যক্তি সফর মাসে আপনার নিকট আসে, আর আপনার যাকাত আদায়ের সময় হবে রামাদানে, তা হলে তাকে যাকাতের নিয়্যতে দান করতে পারেন। রামাদানে যাকাত আদায়ের সময় এই যাকাতের অর্থ তা থেকে কম করে নেবেন।

যাকাতের হকদার

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন—

﴿إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

যাকাত হল কেবলমাত্র ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের অন্তর জয় করার প্রয়োজন তাদের হক; এবং তা দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং

মুসাফিরদের জন্য। এটা হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহা প্রজ্ঞাময়। [সূরা তাওবা : আয়াত : ৬০]

আয়াতে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারাই হল যাকাতের হকদার। এদের ছাড়া অন্য কাউকে যাকাত দেওয়া জায়েয হবে না। নবীজি ﷺ বলেছেন–

إنّ الله تعالى لم يَرْضَ بِحُكمِ نَبِيَ ولا غَيْرِهِ في الصَّدَقاتِ حَتَّى حَكَمَ فيها هوَ فَجَزَّأَها ثَمانِيَةَ أجْزاءٍ

যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোনো নবী বা অন্য কারও হুকুমে রাজি নন। এ কারণেই তিনি নিজেই এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। সেটাকে আট ভাগে ভাগ করেছেন। [সুনানে আবু দাউদ]

যাকাতের হকদাররা হল–

১-২. ফকির-মিসকিন : এরা হল এমন লোক, যাদের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা নেই। মিসকিন থেকে ফকির বেশি অভাবী। ফকির-মিসকিনকে এ পরিমাণ দেবে, যেন তাদের ও তাদের ভরণপোষণের আওতাধীনদের এক বছরের খরচের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তারা যদি পরিমিতভাবে ব্যয় করতে না জানে, যার ফলে এক বছরেরটা এক মাসেই ব্যয় করে ফেলবে, তা হলে নির্ভরযোগ্য কাউকে দেওয়া যেতে পারে, যিনি পুরো বছর ভাগ ভাগ করে তাদেরকে দেবেন।

তবে ধনী ব্যক্তি, বা সামর্থ্যবান ব্যক্তি, যার উপার্জন করার শক্তি আছে, তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ

সদকা [যাকাত] ধনী ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না, সুস্থ ও সমর্থ ব্যক্তির জন্যও হালাল হবে না। [সুনানে নাসাই, মুসনাদে আহমাদ]

৩. যাকাত আদায়কারী : এরা হল যাকাতদাতাদের থেকে যাকাত সংগ্রহকারী। এদেরকে এদের কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেবে। তবে তাদের জন্য যদি বেতন নির্ধারিত থাকে, তা হলে যাকাত থেকে তাদের কিছুই দেওয়া যাবে না, যেমনটা বর্তমানে অনেকখানে চলছে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের বেতন দেওয়া হয়। তাই যাকাত থেকে কিছু নেওয়া তাদের জন্য হারাম হবে।

৪. যাদের অন্তর জয় করা হবে : এরা দু ধরনের- মুসলমান ও কাফের। ইসলামের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ার জন্য, বা তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাফেরদেরকে যাকাত দেওয়া হবে। আর মুসলমানদেরকে যাকাত দেওয়া হবে তাদের ঈমান মজবুত হওয়ার জন্য এবং দীনের ওপর অটল থাকার জন্য।

৫. দাসমুক্তি : যে সব মুসলমান গোলাম তাদের মনিবের সাথে অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি করেছে, তাদেরকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে।

৬. ঋণগ্রস্ত : এরা দু' রকম–

এক. অন্যের জন্য ঋণগ্রস্ত, যে অন্যদের মধ্যে আপস করার জন্য ঋণী হয়। যেমন দুটি গোত্রের মধ্যে সম্পদ বা অন্য কিছু নিয়ে বিবাদ রয়েছে। এতে তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে। কেউ তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করল, এবং তাদের বিবাদ মেটানোর জন্য নিজের পক্ষ থেকে মাল দেওয়ার কথা বলল। তা হলে সে যে অর্থ আদায়ের জিম্মা নিয়েছে, তা যাকাতের মাল থেকে আদায় করা যাবে।

দুই. নিজের জন্য ঋণগ্রস্ত, যেমন কেউ চিকিৎসা বা ঘরবাড়ি নির্মাণ বা অন্য কোনো বৈধ কাজে ঋণ নিল, আর তা পরিশোধ করার সামর্থ্য তার নেই, তা হলে যাকাত থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা যাবে।

তিন. আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায়। এরা হলেন মুজাহিদ।

চার. মুসাফির, যে মুসাফির তার সফরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তার পাথেয় হারিয়ে যাওয়ার কারণে বা ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে। তাকে এ পরিমাণ যাকাতের অর্থ দেবে, যেন সে তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারে।

যাকাতদাতার জন্য তার আপনজনদের যাকাত দেওয়া মুস্তাহাব। যেমন ভাই-বোন। [তবে পিতামাতা বা ছেলেমেয়েকে দেওয়া যাবে না।] কারণ, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

صَدَقَتُكَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

নিকটাত্মীয়দের দান করলে সদকাও হয়, এবং ছেলায়ে-রেহমিও হয়। [মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযি, ইবনে মাজা]

নবীজি ﷺ-কে এক নারী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ তার ভ্রাতৃষ্পুত্ররা তার নিকট প্রতিপালিত হচ্ছে। তাদেরকে কি যাকাত খাওয়ানো যাবে?’ তিনি বললেন, ‘ হ্যাঁ।’ [সহিহ বুখারি]

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

মিসকিনকে দান করলে সদকাই হবে। আর রেহমি সম্পর্কীয়দের দান করলে দুটো কাজ হবে-সদকা ও ছেলায়ে রেহমি। [মুসনাদে আহমাদ]

রামাদানের আহকাম

রামাদানে তারা যা করতেন

উমর ﷺ-র যুগে সাহবায়ে কিরাম তেইশ রাকআত সালাত পড়তেন। আর রামাদানে কুরআন কয়েক খতম দিতেন।

মুআত্তা কিতাবে ইবনে হুরমুয থেকে বর্ণিত, আমি লোকদের দেখেছি, রামাদানে তারা কাফেরদের লা'নত করছেন। ক্বারি সাহেব আট রাকআতে সূরায়ে বাকারা পড়তেন। যদি বারো রাকআত পড়তেন, লোকজন মনে করত, সালাত সহজ করা হয়েছে।

মুআত্তা কিতাবে আছে, আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর তার পিতা থেকে রেওয়ায়াত করেন, 'আমরা রামাদানে কিয়ামুল্লাইল করে [তারাবিহর সালাত পড়ে] আসতাম। তাড়াতাড়ি খাবার আনার জন্য খাদেমকে তাগাদা দিতাম, আবার না ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যায়।'

ইমাম বায়হাকি শু'আবুল ঈমান কিতাবে খালেদ বিন দুরাইক থেকে রেওয়ায়াত করেন, 'বসরায় আমাদের এক ইমাম ছিলেন। তিনি রামাদানে প্রতি তিন রাতে কুরআন এক খতম দিতেন। একবার তিনি পীড়িত হয়ে পড়লে আমরা অন্য একজনকে ইমাম বানালাম। তিনি প্রতি চার রাতে কুরআন এক খতম করতেন। আমরা এটাকে ধরে নিয়েছি, তিনি সালাত হালকা করে ফেলেছেন।'

সায়েব বিন ইয়াজিদ ﷺ বলেন, সালাতে ইমাম সাহেব শত শত আয়াত করে পড়তেন। এমনকি দীর্ঘ কিয়ামের কারণে আমরা লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতাম। আর সালাত থেকে ফিরতে ফিরতে প্রায় ফজরের সময় হয়ে যেত।

ভায়েরা! আমাদের অবস্থাকে তাদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করুন।

তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে

রামাদানের সিয়াম ফরজ। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমনভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। [সূরা বাকারা : আয়াত : ১৮৩]

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ... ... وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইসলামের বুনিয়াদ হল পাঁচটি... রামাদানের সিয়াম। [সহিহ বুখারি]

সিয়ামের ফরজ : কিয়ামতের দিন সওম সিয়াম পালনকারীর জন্য সুপারিশ করবে। বলবে–

الصِّيَامُ يَشْفَعُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ

হে প্রভু! তাকে আমি দিনের বেলায় খাবার ও প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করো। [মুসনাদে আহমাদ]

لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ [যা উপোস থাকার কারণে হয়] আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধ থেকেও অধিক সুগন্ধযুক্ত। [সহিহ মুসলিম]

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় থাকাকালে এক দিন সিয়াম রাখে, আল্লাহ ﷻ তাকে এর ফলে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখেন। [প্রাগুক্ত]

فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

জান্নাতে একটি দরজা আছে। সেটার নাম রাইয়্যান। সেখান দিয়ে শুধু সিয়াম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে, অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তারা প্রবেশ করলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। [সহিহ বুখারি]

রামাদান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এই মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাস হতেও উত্তম।

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ

আর রামাদান মাস এলে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। [প্রাগুক্ত]

রামাদান মাসের সিয়াম দশ মাসের সিয়ামের সমান।

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি রামাদানে ঈমান সহকারে সওয়াবের নিয়্যতে সিয়াম রাখবে, তার অতীতের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। [প্রাগুক্ত]

لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ

প্রত্যেক ইফতারের সময় আল্লাহ ﷻ জাহান্নাম হতে অনেককে মুক্ত করে দেন। [মুসনাদে আহমাদ]

যে ব্যক্তি কোনো উযর ছাড়া রামাদানের একটি সিয়াম ভঙ্গা করল, সে বিরাট কবিরা গোনাহ করল। রাসুল ﷺ যখন বিভিন্ন পাপে পাপীদের শাস্তিসম্পর্কিত স্বপ্নের আলোচনা করছিলেন, তখন বলেছিলেন–

আমি যখন পাহাড়ের মধ্যখানে গেলাম, তখন বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, ' এটা কিসের আওয়াজ?' তারা বলল, ' এটা হল জাহান্নামিদের চিৎকার' । এরপর আমাকে নিয়ে রওয়ানা হল। সেখানে একটি দল দেখতে পেলাম, যাদের হাঁটু বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের চোয়াল ছেঁড়া; সেখান থেকে রক্ত বয়ে পড়ছে। আমি বললাম, ' এরা কারা?' বলল, ' এরা হল সে-সব লোক, যারা সময়ের আগেই ইফতার করেছে। অর্থাৎ এরা সিয়াম পালন করত না' । [ইবনে খুযাইমা]

সিয়ামের আদব ও সুন্নাত

- সাহরির প্রতি আগ্রহ রাখা এবং তাতে বিলম্ব করা চাই। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন– ' তোমরা সাহরি খাও। কারণ, সাহরি খাওয়ার মধ্যে বরকত আছে' । [সহিহ বুখারি]
- তিনি আরও বলেছেন– ' খেজুর মুমিনের কতই না উত্তম সাহরি!' [সুনানে আবু দাউদ]
- জলদি ইফতার করা। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন– ' যতদিন পর্যন্ত মানুষ ইফতারে জলদি করবে, ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে।' [সহিহ বুখারি]
- তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করা। তাজা খেজুর না থাকলে শুকনো খেজুর। শুকনো খেজুরও না থাকলে এক চুমুক পানি দিয়ে ইফতার করবে। [সুনানে তিরমিযি]
- ইফতারের সময় নবীজি ﷺ এ দোয়া পড়তেন–

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ
[সুনানে আবু দাউদ]

- পাপকর্ম থেকে দূরে থাকা। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের কেউ সিয়াম রাখলে পাপকর্ম করবে না ... ।' [সহিহ বুখারি]

- হাদিসে رفث শব্দ এসেছে। এর অর্থ পাপে লিপ্ত হওয়া। [কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ সঙ্গাম করা।] নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুসারে আমল ছাড়ে না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।' [সহিহ বুখারি]

- গিবত, অশ্লীল কথা ও মিথ্যা থেকে সিয়াম পালনকারীর বেঁচে থাকা চাই। কারণ, এর কারণে তার সিয়ামের সওয়াবই নষ্ট হয়ে যায়। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'অনেক সিয়াম পালনকারী এমন আছে, যার সিয়ামের মধ্যে উপোস থাকাটাই সার।' [ইবনে মাজা]

- কাউকে গালি দেবে না এবং কারও সাথে বিবাদ করবে না। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কেউ যদি তার [সিয়াম পালনকারীর] সাথে বিবাদ করে বা গালি দেয়, সে বলবে, 'আমি সিয়াম রেখেছি; আমি সিয়াম রেখেছি'।" [সহিহ বুখারি]

- খাবারে অপচয় না করা। হাদিসে আছে, 'আদমসন্তান উদর থেকে মন্দ কোনো ভাণ্ড পূর্ণ করেনি।' [সুনানে তিরমিযি]

- সদকার মাধ্যমে দয়া ও বদান্যতা করা, এবং অভাবীদের সহযোগিতা করা। নবীজি ﷺ ছিলেন সবচেয়ে বেশি দানশীল। আর তিনি সবচেয়ে বেশি দান করতেন রামাদান মাসে, যখন জিবরাঈল عليه السلام তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি রামাদানের প্রতি রাতে সাক্ষাৎ করতেন। তাকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। তখন

রাসুল ﷺ কল্যাণবাহী বাতাস থেকেও বেশি দানশীল হতেন। [সহিহ বুখারি]

- সিয়াম রাখা ও লোকদের খাওয়ানো-এ দুটোর সমন্বয় হলে জান্নাত। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'জান্নাতের কিছু কক্ষ আছে, যেগুলোর ভিতর থেকে বাহির, এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যায়। সেগুলো আল্লাহ ﷻ প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের জন্য, যারা অপরকে খাওয়ায়, নম্র কথা বলে, সব সময় সিয়াম রাখে, এবং রাতের বেলায় মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন সালাত পড়ে।' [মুসনাদে আহমাদ]

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো সিয়ামদারকে ইফতার করাবে, সে তারই মত সওয়াব পাবে। অথচ সিয়াম পালনকারীর সওয়াব থেকে কিছুই কমবে না।' [সুনানে তিরমিযি] ইফতার করানো দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাকে তৃপ্তি সহকারে আহার করানো।

সিয়ামের কিছু আহকাম

কিছু সিয়াম অবিচ্ছিন্নভাবে পালন করতে হয়। যেমন রামাদানের সিয়াম, ভুল হত্যার কাফ্ফারার সিয়াম, এবং দিনের বেলায় স্ত্রীসহবাসের সিয়াম।

কিছু সিয়াম অবিচ্ছিন্নভাবে পালন করা জরুরি নয়। যেমন রামাদানের কাজা সিয়াম, কসমের কাফ্ফারার সিয়াম।

শুক্রবার একদিন সিয়াম পালন করতে নবীজি ﷺ নিষেধ করেছেন। [সহিহ বুখারি]

দুই ঈদের দুই দিন এবং তাশরিকের দিনগুলোয় [১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ] সওম রাখা হারাম। কারণ, এগুলো হল কুরবানির গোশত খাওয়ার দিন, পান করার দিন এবং আল্লাহ ﷻ-র যিকিরের দিন। তবে হজ্জ পালনরত ব্যক্তি যদি হাদি [কুরবানির পশু] না পায়, তা হলে মিনায় সওম রাখতে পারবে।

রামাদানের চাঁদ দেখা দ্বারা বা শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া দ্বারা রামাদান সাব্যস্ত হবে।

বোধশক্তিসম্পন্ন, মুকিম, সামর্থ্যবান এবং বাধা [যেমন হায়েয নিফাস] হতে মুক্ত প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের ওপর সওম রাখা ফরজ।

নিম্নে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের একটি পাওয়া গেলে প্রাপ্তবয়স্ক হবে–

স্বপ্নদোষের কারণে বা অন্য কোনোভাবে বীর্যপাত হলে; নিম্নাঙ্গে পশম উঠলে; পনেরো বছর পূর্ণ হলে। মেয়েদের ব্যাপারে আরেকটি বিষয়ও আছে-হায়েয। হায়েয হলেও প্রাপ্তবয়স্কা হবে এবং তার ওপর সওম ওয়াজিব হবে।

সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাকে সওম রাখার নির্দেশ দেবে, যদি তার সওম রাখার শক্তি থাকে। তার সওমের সওয়াব সে-ও পাবে, তার পিতামাতাও পাবে।

রুবাই' বিনতে মুআওব্বেয ﵁ বলেন, 'আমরা আমাদের বাচ্চাদের সওম রাখাতাম। তাদের জন্য তুলা দিয়ে খেলনা বানিয়ে রাখতাম। খাওয়ার জন্য কাঁদলে সেটা দিতাম। এভাবে ইফতারের সময় হয়ে যেত।' [সহিহ বুখারি]

দিনের বেলা কোনো কাফের যদি মুসলমান হয়, বা কেউ প্রাপ্তবয়স্ক হয় বা উন্মাদের জ্ঞান ফিরে আসে, তা হলে তাদের জন্য বাকি দিন সওম পালনকারীর মত থাকা ওয়াজিব। কারণ, এখন তাদের ওপর সওম ওয়াজিব হয়েছে। আগের যেসব সওম বাদ গেছে, সেগুলোর কাজা আদায় করতে হবে না। অবশ্য যেদিনে ওয়াজিব হয়েছে, সেদিনের কাজা আদায় করলে ভাল।

উন্মাদের ওপর শরিয়তের হুকুম প্রযোজ্য নয়। কোনো ব্যক্তি যদি কখনও উন্মাদ থাকে, আর কখনও সজ্ঞান থাকে, তা হলে সজ্ঞান থাকার সময় সওম রাখা ওয়াজিব, উন্মাদ থাকার সময় ওয়াজিব নয়। যদি দিনের বেলা উন্মাদনা দেখা দেয়, তা হলে সওম বাতিল হবে না, যেমন রোগ ইত্যাদির কারণে অচেতন হয়ে পড়লে সওম বাতিল হয় না। কারণ, সওমের নিয়্যত করার সময় সে সজ্ঞান ছিল। মৃগীরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হুকুমও তদ্রূপ।

রামাদান মাসে কেউ মারা গেলে অবশিষ্ট সওমের ব্যাপারে তার ওপর বা তার অভিভাবকদের ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মুসাফিরের সওম

মুসাফিরের জন্য সওম না রাখা জায়েয আছে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

যে রোগাক্রান্ত থাকবে বা সফরে থাকবে, সে অন্য দিনগুলোয় সওম পালন করবে। [সূরায়ে বাকারা : আয়াত ১৮৫]

কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে সফরে সওম না রাখার অনুমতি আছে–

সফর [শরিয়তের পরিভাষা অনুযায়ী ৮০ কি.মি. দূরে সফর করার উদ্দেশ্যে] হতে হবে। [মাসআলাটি নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।]

শহরের সীমানা পেরিয়ে যেতে হবে। কাজেই শহর ত্যাগ করার আগে সওম না রাখার অনুমতি থাকবে না।

বিমানযোগে ভ্রমণ করলে বিমান শূন্যে ওঠার পর শহরের সীমানা পেরিয়ে গেলে এ অনুমতি থাকবে। বিমানবন্দর শহরের বাইরে হলে সেখানে সওম না রাখার অনুমতি থাকবে। আর যদি বিমানবন্দর শহরের মধ্যে হয় বা তৎসংলগ্ন হয়, তা হলে সওম ভাঙবে না। কারণ, সে শহরে আছে বলেই ধরে নেওয়া হবে।

সওম না রাখার কৌশল হিসেবে সফর হতে পারবে না।

মুসাফির ব্যক্তি সওম রাখার সামর্থ্য রাখুক বা না রাখুক, সওম তার জন্য কষ্টকর হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায়ই তার জন্য সওম না রাখার অনুমতি আছে।

কোনো ব্যক্তি সূর্যাস্তের পর ইফতার করল। এরপর যখন বিমান শূন্যে উঠল, তখন সূর্য দেখা গেল, তা হলে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে না। কারণ, যে ইবাদত সে সম্পন্ন করে ফেলেছে, তা পুনরায় আদায় করতে হবে না।

সূর্যাস্তের পূর্বে যদি বিমান শূন্যে ওঠে, এবং ওই দিনের সওম পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকে, তা হলে সূর্যাস্তের পরই ইফতার করবে, চাই সিয়াম পালনকারী যেখানেই থাকুক। সূর্যকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে বিমানকে মাটিতে নামিয়ে আনা জায়েয হবে না। কারণ, এটি একটি কৌশল বা বাহানা। তবে কোনো সুবিধার জন্য যদি বিমান অবতরণ করে, আর সেখান থেকে সূর্য দেখা না যায়, তা হলে ইফতার করবে। [ফতোয়ায়ে শায়খ ইবনে বায]

যে ব্যক্তি কোনো শহরে গিয়ে চার দিনের বেশি থাকার নিয়্যত করেছে, তার ওপর সওম ওয়াজিব। [মাসআলাটি নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।] কাজেই যে ব্যক্তি পড়ালেখার জন্য কয়েক মাস বা কয়েক বছরের জন্য দেশের বাইরে থাকে, সে মুকিমের হুকুমে। তাকে সওমও রাখতে হবে, এবং সালাতও পুরো পড়তে হবে।

কোনো মুসাফির যদি সওম না রাখা অবস্থায় নিজের শহর ব্যতীত অন্য শহরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তা হলে তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে না। হ্যাঁ, যদি চার দিনের অধিক সময়

থাকার নিয়্যত করে, তা হলে পানাহার থেকে বিরত থেকে সওম পালন করবে। কারণ, সে তখন মুকিমের হুকুমে।

যাদের বেশি বেশি সফর করতে হয়, যেমন দূতাবাসের কর্মচারি, টেক্সিড্রাইভার, বিমানের পাইলট, যদি তাদের সফর প্রাত্যহিক হয়, তা হলে তাদের জন্য সওম ভাঙার অনুমতি আছে। সে-ক্ষেত্রে পরবর্তীতে কাজা করবে।

কোনো মুসাফির যদি সওম না রাখা অবস্থায় দিনের বেলা নিজ শহরে ফিরে আসে, তাকে বাকি দিন পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে কি না এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে। সতর্কতার দাবি হল, পবিত্র মাসের সম্মানার্থে পানাহার থেকে বিরত থাকা। আর সেটার কাজা আদায় করতে হবে।

কোনো ব্যক্তি নিজ শহরে সওম শুরু করল। এরপর মাসের শেষদিকে অন্য কোনো শহরে গেল। ওই শহরবাসীরা তার এক দিন আগে বা এক দিন পর সওম রেখেছে। তা হলে সে তাদেরই সাথে সওম রাখবে এবং ঈদ করবে, যদিও সওম ত্রিশ দিন হতে এক দিন বেশি হয়। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> সওম হল সেদিন, যেদিন তোমরা সওম রাখ, এবং ইফতার [সওম না রাখা] হল সেদিন, যেদিন তোমরা ইফতার কর। [তিরমিযি, দারকুতনি]

আর যদি সওম ঊনত্রিশ দিন থেকে একদিন কম হয়, তা হলে ঈদের পর তা পূর্ণ করতে হবে। কারণ, হিজরি মাস ঊনত্রিশ দিনের কম হয় না। [ইবনে বায]

হিদায়াত

কিতাবুত্তাওয়াবীনে ইবনে কুদামা ﷺ আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়দ থেকে বর্ণনা করেন, আমি একটি নৌকায় ছিলাম। ঝড়ো হাওয়া আমাদের একটি দ্বীপে নিয়ে গেল। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, মূর্তির পূজা করছে। তাকে বললাম, ' তুমি কিসের পূজা কর?' সে মূর্তির দিকে ইশারা করল। আমরা বললাম, ' আমাদের নৌকায় এমন ব্যক্তি আছে, যে এরূপ মূর্তি বানাতে পারে। আর এটা উপাসনাযোগ্য প্রভুও নয়।'

সে বলল, ' তা হলে তোমরা কার উপাসনা কর?'

আমরা বললাম, ' আল্লাহর।'

সে বলল, ' আল্লাহ কী?'

আমরা বললাম, ' তিনি সে সত্তা, আকাশে যার সিংহাসন, জমিনে তার রাজত্ব, মৃত ও জীবিতদের ওপর তার হুকুম চলে।'

সে বলল, ' এটা তোমরা কীভাবে জানলে?'

আমরা বললাম, ' ওই বাদশাহ আমাদের নিকট একজন দয়ালু রাসুল পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে এসব জানিয়েছেন।'

সে বলল, ' রাসুলের কী হয়েছে?'

আমরা বললাম, ' তিনি রিসালতের দায়িত্ব আদায় করেছেন। এরপর আল্লাহ ﷻ তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন।'

সে বলল, ' তোমাদের নিকট কি তিনি এর কোনো নিদর্শন রেখে যাননি?'

আমরা বললাম, ' রেখে গেছেন। ওই বাদশাহর কিতাব রেখে গেছেন।'

সে বলল, ' ওই কিতাবটি আমাকে দেখাও। তা অবশ্যই সুন্দর একটি কিতাব হবে।'

আমরা তার নিকট কুরআন নিয়ে এলাম। সে বলল, ' আমি এটা পড়তে পারি না।' আমরা তাকে কুরআনের একটি সূরা পড়ে শোনালাম। আমরা পড়ছিলাম, আর সে কাঁদছিল। এভাবে সূরা শেষ করলাম।

সে বলল, ' এ কালাম যার, তার নাফরমানি করা ঠিক হবে না। এরপর সে ঈমান আনল।'

তাকে আমরা সাথে করে নিলাম। শরিয়তের আহকাম শেখালাম। কুরআনের কিছু সূরা শেখালাম। সঙ্গে করে নৌকায় নিয়ে নিলাম। সফর শুরু হল। রাত গভীর হলে আমরা ঘুমাতে গেলাম। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করল, ' আরে ভাই! তোমরা আমাকে যে উপাস্যের কথা বলেছ, রাত গভীর হলে তিনি কি ঘুমান?'

আমরা বললাম, ' না, হে আল্লাহর বান্দা! তিনি মহান, চিরস্থায়ী; তিনি ঘুমান না।'

সে বলল, ' তা হলে নিকৃষ্ট বান্দা তোমরা! তোমরা ঘুমাচ্ছ, অথচ তোমাদের প্রভু ঘুমান না।'

এ কথা বলে আমাদের ছেড়ে সে ইবাদতে লেগে গেল।

আমরা আমাদের শহরে পৌঁছলে সঙ্গীদের বললাম, ' এ তো নতুন মুসলমান হয়েছে। আর শহরটাও তার অপরিচিত।' কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তাকে দিলাম।

সে বলল, ' এসব কী?'

আমরা বললাম, ' এগুলো তুমি তোমার প্রয়োজনে ব্যয় কোরো!'

সে বলে উঠল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ আমি সমুদ্রের একটি দ্বীপে থেকে মূর্তির পূজা করেছি। তিনি তখন আমাকে বরবাদ করেননি। আর যখন আমি তাকে চিনতে পেরেছি, তখন কি তিনি আমাকে বরবাদ হতে দেবেন?

এ কথা বলে নিজেই নিজের উপার্জনে লেগে গেল। পরবর্তীতে সে মস্ত বড় এক নেককার ব্যক্তি হল।

পীড়িত ব্যক্তির সওম

পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি, যার জন্য সওম রাখা কষ্টকর, তার জন্য সওম না রাখা জায়েয আছে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ﴾

যে রোগাক্রান্ত থাকবে বা সফরে থাকবে, সে অন্য দিনগুলোয় সওম পালন করবে। [সূরায়ে বাকারা : আয়াত ১৮৫]

সামান্য রোগ, যেমন সর্দি, মাথাব্যথা, এগুলোর কারণে সওম ভাঙা জায়েয হবে না।

যদি সওম রাখলে রোগ বৃদ্ধি পায়, বা নিরাময় হতে বিলম্ব হয়, বা দিনের বেলায় ঔষধ খেতে হয়, তা হলে সওম না রাখা জায়েয আছে। বরং সওম রাখা মাকরূহ। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

আল্লাহ তোমাদের ওপর সহজ করতে চান; তোমাদের ওপর কঠিন করতে চান না। [সূরায়ে বাকারা : আয়াত ১৮৫]

সওম রাখলে যদি কেউ অচেতন হয়ে পড়ে, পুরো দিন সওম রাখা না যায়, তা হলে সওম ভঙ্গ করবে এবং পরবর্তীতে কাজা করবে।

যদি সওমেরত অবস্থায় দিন শুরু হয়, কিন্তু সিয়াম পালনকারী দিনের বেলা অচেতন হয়ে পড়ে, আর সূর্যাস্তের পূর্বে বা পরে হুঁশ ফিরে আসে, তা হলে তার সওম শুদ্ধ হবে, যদি এর মধ্যে সে পানাহার না করে থাকে।

কেউ যদি অচেতন হয়ে পড়ে, বা তাকে কোনো কারণে অনুভূতিনাশক ঔষধ দেওয়া হয়, এবং সে অসাড় হয়ে পড়ে, তা যদি তিন দিন বা তিন দিনের কম হয়, তা হলে এ দিনগুলোর সওম কাজা করবে, ঠিক ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তির মত। আর যদি তিন দিনের অধিক হয়, তা হলে সেগুলোর কাজা আদায় করতে হবে না, ঠিক উন্মাদনার কারণে অজ্ঞান ব্যক্তির মত। [ইবনে বায]

যে রোগের নিরাময় হওয়ার আশা করা যায়, তার নিরাময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। সওম রাখা কষ্টকর হলে সওম রাখবে না; পরে কাজা করে নেবে।

আর পুরাতন রোগের রোগী, যার সুস্থতা লাভের আশা নেই, বা যে বয়োবৃদ্ধ, সওম রাখতে বা কাজা করতে সক্ষম নয়, তার প্রতিটি সওমের জন্য শহরের প্রচলিত খাবার থেকে আধা ছা' করে দান করবে।

যে রোগী রামাদানের কিছু সওম ভেঙেছে, এবং সুস্থ হয়ে কাজা রাখার আশায় আছে, এরপর জানতে পেরেছে, তার রোগ দীর্ঘস্থায়ী, এবং সে কখনও কাজা রাখতে পারবে না, প্রতিটি কাজা সওমের জন্য সে একজন মিসকিনকে খাওয়াবে।

যে ব্যক্তি আরোগ্যযোগ্য রোগে সুস্থ হওয়ার আশাবাদী ছিল, কিন্তু কাজা আদায় করার সময় পাওয়ার আগেই মারা গেছে, তার ওপর বা অভিভাবকদের ওপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। যেমন পঁচিশে রামাদানে কারও অস্ত্রোপচার হল; আর কাজা করার নিয়্যতে বাকি দিনগুলো সওম রাখল না। ত্রিশে রামাদান সে মারা গেল। তা হলে তার পরিবারের লোকদের ওপর তার পক্ষ থেকে মিসকিনকে খাওয়ানো আবশ্যক হবে না।

কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে সওম ভঙ্গ করল। এরপর সুস্থ হল। কাজা রাখার সুযোগ পেল। কিন্তু কাজা রাখল না। অলসতা করল। এরপর মারা গেল। তা হলে তার সম্পদ থেকে প্রতিটি সওমের জন্য এক মিসকিনের খাবার দান করতে হবে। তার আত্মীয়দের কেউ যদি তার পক্ষ থেকে দান করে দেয়, তা হলে আরও ভাল। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> কেউ যদি মারা যায়, আর তার ওপর সওম থাকে, তা হলে তার ওলি [অভিভাবক] তার পক্ষ থেকে সওম রাখবে। [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

যেমন, রামাদানের পঁচিশ তারিখে কারও অস্ত্রোপচার হল। ত্রিশ তারিখে সে সুস্থ হল। কিন্তু কাজা রাখতে অলসতা করল। এরপর যিলহজ্জ মাসে সে মারা গেল। তা হলে তার পরিবারের লোকজন তার পক্ষ থেকে সওম রাখবে বা খাবার খাওয়াবে।

কোনো ব্যক্তি রোগাক্রান্ত ছিল। তার রোগ স্থায়ী ধরে নেওয়া হয়েছিল। ফলে সে সওম রাখেনি, বরং তার পক্ষ থেকে মিসকিনকে খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে চিকিৎসাশাস্ত্রে উন্নতি ঘটল। তার রোগের ঔষধ আবিষ্কার হল। তা ব্যবহার করে সে সুস্থতা লাভ করল। তা হলে আগের সওমগুলো তার কাজা করতে হবে না। কারণ, তখন তার যা করণীয় ছিল, সে তা করেছে। [আল্লাজনাতুদ্দায়েমা]

প্রচণ্ড ক্ষুধা বা তৃষ্ণার কারণে ভয় হল, পানাহার না করলে মারাই যাবে। তা হলে সে সওম ভঙ্গ করবে এবং পরবর্তীতে কাজা রাখবে।

সহনীয় পর্যায়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণা হলে বা ক্লান্তি অনুভব হলে বা রোগ হওয়ার কল্পনা হলে সওম ভাঙা জায়েয হবে না।

যারা কঠোর পরিশ্রম করে, যেমন কামার, কাঠুরে বা সড়ক-কর্মচারি, এদের জন্য সওম ভঙ্গ করা জায়েয হবে না। যদি সওম তাদের ক্ষতি করে এবং দিনের বেলা তাদের মৃত্যুর আশঙ্কা হয়, তা হলে তারা তাদের কষ্ট লাঘব করার পরিমাণ পানি বা খাবার খাবে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কিছুই খেতে পারবে না। আর পরবর্তীতে কাজা রাখবে। এরূপ

কঠোর পরিশ্রম যাদের করতে হয়, তাদের জন্য রাতের শিফটে কাজ করার ব্যবস্থা করা চাই।

ছাত্রদের পরীক্ষার অজুহাতে সওম ভঙ্গা করা জায়েয হবে না।

মিসকিনকে দুভাবে খাওয়ানো যেতে পারে- মাসের শেষে একই দিনে ত্রিশজন মিসকিনকে খাওয়ানো যেতে পারে, আবার প্রতিদিন একজনকে খাওয়ানো যেতে পারে।

অতিশয় বয়োবৃন্ধ ও সওম রাখতে অক্ষম ব্যক্তি, দৈহিক দুর্বলতার কারণে যার জন্য সওম রাখা কষ্টকর, তার জন্য সওম রাখা জরুরি নয়। প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনতে খাওয়াবে।

বার্ধক্যের কারণে যার জ্ঞানবুন্ধি লোপ পেয়ে গেছে, জ্ঞান না থাকার কারণে তার ওপর সওম ওয়াজিব নয়। কারণ, সওম ওয়াজিব হওয়ার জন্য একটি শর্ত হল জ্ঞান থাকা। আর এ ব্যক্তি তা হারিয়েছে। তাই তার ওপর বা তার পরিবারের ওপর কোনোকিছু ওয়াজিব হবে না।

এই বৃন্ধের যদি মাঝেমধ্যে বোধশক্তি ফিরে আসে, আর মাঝেমধ্যে প্রলাপ বকে, তা হলে বোধশক্তির সময়ের সওম রাখতে হবে, প্রলাপ বকার সময়ের নয়।

সওমের নিয়্যত

প্রত্যেক ওয়াজিব সওমের জন্য রাতেই নিয়্যত করা শর্ত। যেমন রামাদানের সওম, কাজা সওম এবং কাফ্‌ফারার সওম। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

রাত্র থেকেই যে সওম রাখেনি, তার সওম নেই। [আবু দাউদ]

নিয়্যত হল কোনো কাজ করার ব্যাপারে মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করা। নিয়্যত উচ্চারণ করা বিদ'আত। কারও জানা আছে, আগামীকাল

রামাদান, আর সে আগামীকাল সওম রাখার ইচ্ছাও করেছে। এতেই নিয়্যত হয়ে গেছে।

তবে নফল সওমের ক্ষেত্রে রাতে নিয়্যত করার শর্ত নেই। আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত আছে, "রাসুল ﷺ একদিন আমার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের নিকট [খাওয়ার] কিছু কি আছে?' আমরা বললাম, 'নেই।' তিনি বললেন, 'তা হলে আমি সওম রাখলাম'।" [সহিহ মুসলিম]

ওয়াজিব সওম শুরু করলে তা পূর্ণ করা আবশ্যক। যেমন কাজা, কাফ্‌ফারা ও মান্নতের সওম। তবে নফল সওমের ক্ষেত্রে হাদিসের ভাষ্য হল, নফল সিয়াম পালনকারী নিজের আমির, চাইলে সওম পূর্ণ করবে, চাইলে ভঙ্গ করবে, যদিও কোনো উযর না থাকে। [মুসনাদে আহমদ]

সূর্যোদয়ের পর রামাদান মাস আসার কথা জানা গেল। তা হলে বাকি দিন কিছুই খাওয়া যাবে না। আর এই সওমের কাজাও রাখতে হবে। এটাই সকল ইমামের মত। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

রাত্র থেকেই যে সওম রাখেনি, তার সওম নেই। [আবু দাউদ]

সওম ও ইফতারের আহকাম

সূর্য অস্ত গেলে সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'যখন এখান থেকে রাত্র এগিয়ে আসে এবং এখান থেকে দিন পিছিয়ে যায় এবং সূর্য অস্ত যায়, তখন ইফতারের সময় হয়। [সহিহ বুখারি]
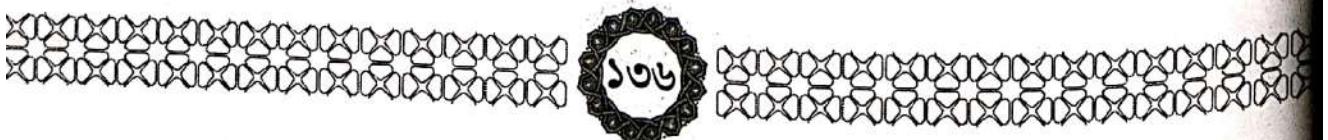
ইফতার জলদি করা সুন্নাত। নবীজি ﷺ ইফতার না করে মাগরিবের সালাত পড়তেন না, যদিও এক চুমুক পানি দিয়ে হোক। [হাকেম]

সুন্নাত হল তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করা, তা পাওয়া না গেলে শুকনো খেজুর দিয়ে, তা-ও পাওয়া না গেলে এক চুমুক পানি দিয়ে। কারণ, নবীজি ﷺ সালাতের আগে তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর দিয়ে করতেন। আর যখন শুকনো খেজুরও হত না, তখন এক চুমুক পানি পান করে নিতেন। [মুসনাদে আহমদ]

যদি তাজা বা শুকনো খেজুর কিংবা পানি পাওয়া না যায়, তা হলে যা পাওয়া যায়, তা দিয়েই ইফতার করবে। যদি কোনো কিছুই পাওয়া না যায়, তা হলে মনে মনে সওম ভঙ্গের নিয়্যত করবে।

ইফতারের সময় যা ভাল লাগে, তার প্রার্থনা করবে। কারণ, ইফতারের সময় সওম পালনকারীর একটি দোয়া [অবশ্যই কবুল হয়, তা] প্রত্যাখ্যাত হয় না। নবীজি ﷺ ইফতারের সময় বলতেন–

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

[আবু দাউদ, দারকুতনি]

সাবধান! সময়ের আগে ইফতার করবে না। কারণ, নবীজি ﷺ-কে কিছু পাপীর শাস্তি দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেন–

এরপর আমাকে নিয়ে রওয়ানা হল। সেখানে একটি দল দেখতে পেলাম, যাদের হাঁটু বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের চোয়াল ছেঁড়া; সেখান থেকে রক্ত বয়ে পড়ছে। নবীজি বলেন, 'আমি বললাম, এরা কারা?' [জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম] বলল, 'এরা হল তারা, যারা সময়ের আগেই ইফতার করেছে'। [ইবনে খুজাইমা]

ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই সিয়াম পালনকারী পানাহার থেকে বিরত থাকবে, চাই আযান শুনুক বা না শুনুক। যদি জানা থাকে যে, ফজরের ওয়াক্ত শুরু হতেই মুআয্যিন আযান দেয়, তা হলে আযান শোনার সাথে সাথেই পানাহার বন্ধ করতে হবে। আর যদি জানা থাকে, মুআয্যিন সতর্কতাস্বরূপ ফজরের ক্ষণিক আগে আযান দেয়, তা

হলে আযান শুরু হওয়া পর্যন্ত বা আযানের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পানাহার করা যাবে। আর যদি মুআয্যিনের অবস্থা সম্বন্ধে জানা না থাকে [যে, কখন আযান দেয়,] বা মুআয্যিন অনেক থাকে, তা হলে সালাতের সময়সূচির ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চলবে।

ফজরের দশ মিনিট আগে যে সতর্কতামূলক পানাহার বন্ধ করা হয়, এটা বিদ'আত। আর কোনো কোনো ক্যালেন্ডারে দেখা যায়, পানাহার বন্ধ করার একটি ঘর এবং সালাতের সময় শুরুর আরেকটি ঘর। এটা সুন্নাতের খেলাফ।

যেসব দেশে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিন-রাতের আবর্তন ঘটে, সেখানকার মুসলমানদের ওপরও সওম রাখা ফরজ, যদিও দিন দীর্ঘ হয়। আর যেসব দেশে দিন ও রাতের পরিবর্তন হতে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে, তারা তাদের নিকটবর্তী যে দেশে চব্বিশ ঘণ্টায় দিন-রাতের পরিবর্তন ঘটে, সে-দেশের হিসেবে সওম রাখবে।

সওমভঙ্গের কারণ

১. সঙ্গাম: যে ব্যক্তি সওমের দিনে স্বেচ্ছায় পূর্ণ সঙ্গাম করে, তার সওম নষ্ট হয়ে যায়, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। এরূপ হলে তার ওপর চারটি বিষয় ওয়াজিব হয়–

এক. তওবা করা;

দুই. ওই দিনের সওম পূর্ণ করা;

তিন. রামাদানের পর ওই দিনের সওমের কাজা রাখা, এবং

চার. কাফ্ফারায়ে মুগাল্লাযা আদায় করা।

কাফ্ফারায়ে মুগাল্লাযা হল, একটি দাস বা দাসী আজাদ করা। দাস-দাসী পাওয়া না গেলে অবিচ্ছিন্নভাবে দু' মাস সওম রাখা। তা পারা না গেলে ষাট জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।

হাদিসে আছে, এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি!' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে তোমার?' সে বলল, 'সওম অবস্থায় আমি স্ত্রীসঙ্গাম করে বসেছি।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজাদ করার মত কোনো দাস-দাসী কি আছে?' সে বলল, 'নেই।' তিনি বললেন, 'অবিচ্ছিন্নভাবে দু' মাস কি সওম রাখতে পারবে?' সে বলল, 'না।' জিজ্ঞাসা করলেন, 'ষাটজনকে কি খাওয়াতে পারবে?' সে বলল, 'না।' [সহিহ বুখারি]

সব ধরনের সঙ্গামের ক্ষেত্রেই এই হুকুম প্রযোজ্য [এমনকি, ব্যভিচার, পুংমৈথুন ও পশুর সাথে সঙ্গামের ক্ষেত্রেও]।

যে ব্যক্তি একই রামাদানে দিনের বেলায় কয়েক দিন সঙ্গাম করল, তা হলে যত দিন সে সঙ্গাম করেছে, ততটি কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর ওই দিনগুলোর সওমও কাজা করতে হবে। এরূপ করলে যে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, তা তার জানা না থাকার কারণে কাফ্ফারা মাফ হবে না। কাজেই সঙ্গাম করে যদি বলে, 'আমার তো জানা আছে, সঙ্গাম করলে সওম ভঙ্গা হয়, কিন্তু কাফ্ফারায়ে-মুগাল্লাযা যে ওয়াজিব হয়, তা তো জানা নেই', তা হলেও তার ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। [আল্লাজনাতুত্দায়েমা]

সওমের দিনে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে স্বামী সঙ্গাম করল। তা হলে স্ত্রীর হুকুমও স্বামীর মতই। [তার ওপরও কাফ্ফারায়ে-মুগাল্লাযা ওয়াজিব হবে।] তবে যদি স্বামী জোরপূর্বক সঙ্গাম করে, আর স্ত্রীও তাকে যথাসাধ্য বাধা দেয়, কিন্তু বিরত রাখতে না পারে, তা হলে তার ওপর কোনো কাফ্ফারা আসবে না। সতর্কতামূলক শুধু ওই দিনের সওম কাজা করবে। তবে স্বামীর ওপর পূর্ববর্ণিত কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।
স্বামী এরূপ, স্ত্রীর তা জানা থাকলে দূরে দূরে থাকবে, এবং রামাদানের দিনের বেলায় সাজগোজ করবে না। আর রামাদানে যেসব

সওম ভঙ্গা হয়েছে, সেগুলোর কাজা করা ওয়াজিব। কাজা রাখার সময় স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। আর কাজা সওম রাখলে শর' য়ি উযর ছাড়া তা ভঙ্গা করা জায়েয হবে না। আর স্বামীর জন্যও তার সওম নষ্ট করা জায়েয হবে না।

আর নফল সওমের ক্ষেত্রে হুকুম হল, স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া সওম রাখবে না। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> স্বামী উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী সওম রাখবে না। [প্রাগুক্ত]

সওমের মাসে দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গাম করার জন্য এ কৌশল করল- আগে খানা খেয়ে সওম ভঙ্গা করল। এরপর স্ত্রীসঙ্গাম করল। এরূপ করলে আরও বেশি শক্ত গোনাহ হবে। কারণ, সে দু' বার রামাদানের মর্যাদাহানি করেছে-খেয়ে এক বার, সঙ্গাম করে আরেকবার। তার ওপর কাফ্ফারায়ে মুগাল্লাযা ওয়াজিব হবে, এবং তাকে তওবা করতে হবে।

ফজরের আযান হল, অথচ সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি তখনও জুনুবি, সঙ্গাম বা স্বপ্নদোষের গোসল করেনি। তার সওম শুদ্ধ হবে।

২. সওম পালনকারীর কোনো কাজের কারণে উত্তেজনা সহকারে বীর্যপাত: চুমো খাওয়া, স্পর্শ করা, হস্তমৈথুন করা অথবা বারবার দৃষ্টিপাত করার কারণে উত্তেজনা সহকার বীর্যপাত হলে সওম ফাসেদ হয়ে যাবে। শুধু কাজা আদায় করতে হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ, কাফ্ফারা শুধু সঙ্গামের সাথে সম্পৃক্ত। তদ্রূপ কেউ যদি দিনের বেলায় ঘুমায় এবং স্বপ্নদোষ হয়, তা হলে তার সওম শুদ্ধ হবে। কারণ, এটা তার ইচ্ছাধীন নয়। তবে জানাবতের গোসল করতে হবে।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা: আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

> আর পানাহার করো যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর সওম পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত। [সূরায়ে বাকারা : আয়াত ১৮৭]

কেউ যদি ভুলে পানাহার করে ফেলে, তা হলে সওম পূর্ণ করবে। কারণ, আল্লাহ ﷻ তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন। [সহিহ বুখারি]

এক বর্ণনায় আছে, তার ওপর কাজাও ওয়াজিব নয়, কাফ্ফারাও ওয়াজিব নয়।

আর যদি কাউকে ভুলক্রমে খেতে দেখে, তা হলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। কারণ, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾

> তোমরা একে অপরকে সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে সাহায্য করো। [সূরায়ে মায়েদা : আয়াত ২]

তদ্রূপ রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> 'আমি ভুলে গেলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো।'

তা ছাড়া কাজটি একটি নিন্দিত কাজ। তাই তার পরিবর্তন করা ওয়াজিব।

কিছু কাজ সরাসরি পানাহার না হলেও পানাহারের মত। সেগুলোর কারণেও সওম ভঙ্গ হবে। যেমন মুখ দিয়ে ঔষধ-বড়ি খাওয়া; ইনজেকশনের মাধ্যমে খাবার প্রবেশ করানো; রক্তের ইনজেকশন নেওয়া ইত্যাদি।

তবে যে ইনজেকশন দ্বারা খাবার দেওয়া হয় না বা যা পানাহারের প্রয়োজন মেটায় না, শুধু চিকিৎসার জন্য করা হয়, যেমন ইনসুলিন ও পেনিসিলিন। এগুলো সওমের কোনো ক্ষতি করবে না, চাই ইনজেকশন পেশীতে নেওয়া হোক বা শিরায়। তবে, সতর্কতার দাবি হল, ইনজেকশন রাতের বেলায় নেওয়া।

অনিচ্ছাকৃতভাবে গলা দিয়ে কিছু ঢুকে গেল। যেমন অযুর কুলি করার সময় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কিছু পানি ভিতরে চলে গেল। এতে সওম শুদ্ধ থাকবে। তবে সওম পালনকারীর জন্য কুলি করার সময় বা নাকে পানি দেওয়ার সময় সতর্ক থাকা চাই। কারণ, এতে পেটে পানি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> ভালভাবে নাকে পানি দেবে। তবে সিয়াম পালনকারী হলে মুবালাগা করবে না। [তিরমিযি, ইবনে মাজা]

মুখে বা জিহ্বায় আসার আগেই যদি কফ গলায় চলে যায়, তা হলে সওম শুদ্ধ হবে। কারণ, তা বের করা কষ্টসাধ্য। আর যদি মুখে এসে যায় বা জিহ্বায় পৌঁছে যায়, তা হলে তা বের করে ফেলতে হবে। গিলে ফেললে সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভিতরে চলে গেলে সওম ভাঙবে না।

দিনের বেলায় সওম পালনকারীর জন্য মেসওয়াক করা সুন্নাত। মেসওয়াক তাজা হলেও ক্ষতি নেই। নতুন মেসওয়াক দিয়ে মেসওয়াক করলে যদি সেটার স্বাদ হলকে পৌঁছয়, থুতু করে ফেলে দেবে। মেসওয়াকের যে টুকরোগুলো মুখের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে, সেগুলো বের করে দেবে। অনিচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই।

চামড়া সতেজকারী মলম, বা চামড়া মোলায়েম করে এমন ঔষধ মর্দন করলে বা সুগন্ধ শুঁকলে বা আতর ব্যবহার করলে কিংবা ধূপ ব্যবহার করলে সওমের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে পেটের ভিতর নেওয়ার জন্য যদি নস্যি নেয়, তা হলে ভিন্ন কথা।

ধুমপান করলে সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর তা [ধুমপান] সিয়াম পালনকারী ও অরোযাদার, সবার জন্যই হারাম।

সিয়াম পালনকারী যদি এমন কিছু করে, যা দ্বারা তার পিপাসা লাঘব হয়, যেমন গোসল করল বা কুলি করল, তা হলে কোনো ক্ষতি নেই।

রাত বাকি আছে ধারণা করে যদি সিয়াম পালনকারী পানাহার করে, এরপর জানা যায় যে, তখন ফজরের সময় হয়ে গিয়েছিল, তার সওম শুদ্ধ হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

আর পানাহার করো যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর সওম পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত। [সূরায়ে বাকারা : আয়াত ১৮৭]

যেমন, ফজরের আযান হয় চারটার সময়। একব্যক্তি সাহরি খাওয়ার জন্য উঠে দেখল, তার ঘড়িতে সাড়ে তিনটা বাজে। সে সাহরি খাওয়া শুরু করল। এই সময় কাছের মসজিদ থেকে ইকামতের আওয়াজ এল। তখন সে জানতে পারল, তার ঘড়িটি আধা ঘণ্টা পিছিয়ে আছে। তা হলে এখানে যে রাত বাকি আছে ধরে নিয়ে পানাহার করেছে, এবং পরে জানতে পেরেছে, ফজরের সময় হয়ে গেছে, তার সওম শুদ্ধ হবে।

ধারণা হল, সূর্য ডুবে গেছে। তাই ইফতার করে ফেলল। এরপর জানা গেল, সূর্য অস্ত যায়নি। তা হলে [সকল ইমামের মতে] তার সওমের কাজা আদায় করতে হবে। কারণ, এখানে নিশ্চিত ও স্বাভাবিক হল দিবস বাকি থাকা। আর নিশ্চিত বিষয় সন্দেহজনক বিষয় দ্বারা দূর হয় না।

৪. দেহ থেকে রক্ত বের করা : শিঙা লাগিয়ে বা রগ টেনে বা কোনো রোগীকে রক্ত দান করার জন্য রক্ত বের করলে সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে সামান্য পরিমাণ রক্ত বেরলে তা সওমের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। তদ্রূপ নাক থেকে বা ক্ষত থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে রক্ত বেরলে সওমের কোনো ক্ষতি হবে না।

৫. বমি : পেটে যে খাবার বা পানি আছে, ইচ্ছাকৃতভাবে তা মুখ দিয়ে বের করলে সওম ভঙ্গ হবে। তবে যদি বমি আসে, আর তা দমন করা না যায়, অনিচ্ছাকৃতভাবে বেরিয়ে যায়, তা হলে তা সওময় কোনোরূপ প্রভাব ফেলবে না। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

বমি যাকে অক্ষম করে দেয়, তাকে কাজা রাখতে হবে না। আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করে, সে কাজা রাখবে। [আবু দাউদ, তিরমিযি]

সালাতের বিস্ময়

মুহাম্মদ বিন খফিফ রহ.র কোমরে ব্যথা ছিল। সালাতের আযান হলে কারও পিঠে করে মসজিদে নেওয়া হত। তাকে বলা হল, আল্লাহ ﷻ তো আপনাকে মাযুর করেছেন। নিজের ওপর যদি শিথিলতা করতেন!' তিনি বললেন, ' মোটেই নয়! যদি কখনও আমাকে সালাতের কাতারে না দেখ, তা হলে ধরে নিয়ো, আমি কবরের মাটিতে শুয়ে আছি।'

কত সৌভাগ্যবান পীড়িত ব্যক্তি ছিলেন তারা! প্রকৃত অর্থে, পীড়িত তো আমরা!

মনসুর বিন মু'তামির রহিমাহুল্লাহ। রাত হলে তিনি তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন। এরপর বাড়ির ছাদে উঠতেন। সালাত পড়তেন। তিনি মারা গেলে তার প্রতিবেশী এক বালক তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, ' মা! আমাদের প্রতিবেশীর বাড়ির ছাদে রাতে যে খুঁটিটি দেখা যেত, ওটাকে দেখছি না!' তিনি বললেন, ' বেটা! ওটা খুঁটি ছিল না। ওটা ছিল মনসুর। তিনি রাতে দাঁড়িয়ে সালাত পড়তেন। তিনি মারা গেছেন।'

সওমভঙ্গ সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

ওপরে সওমভঙ্গের যেসব কারণ বর্ণিত হয়েছে, [হায়েয ও নিফাস ছাড়া] তিনটি শর্ত পাওয়া গেলেই সেগুলো দ্বারা সওম ভঙ্গা হবে–

১. জানা থাকতে হবে যে, এটা সওম ভঙ্গের কারণ;

২. সে যে সিয়াম পালনকারী, তা তার স্মরণ থাকতে হবে;

৩. ইচ্ছাকৃত হতে হবে, কারও বাধ্য করার কারণে নয়।

কিডনি পরিষ্কার করতে রক্ত বের করতে হয়। এরপর সাথে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করে ভিতরে ঢুকাতে হয়। এরূপ হলে এটা সওম ভঙ্গের কারণ হবে। [আল্লাজনাতুদ্দায়েমা]

পায়ুপথে ইনজেকশন দিলে, চোখে বা কানে ঔষধের ফোঁটা ব্যবহার করলে, দাঁত উঠালে, ক্ষতস্থানে ঔষধ দিলে সওম ভঙ্গা হবে না। কারণ, এগুলো পানাহারের কাজ দেয় না।

ইনহেলার ব্যবহার করলে সওম ভঙ্গা হয় না। কারণ, এটা একটা গ্যাস, খাবার নয়। আর শ্বাসকষ্টের রোগীকেও রামাদানে এটা ব্যবহার করতে হচ্ছে।

পরীক্ষা করার জন্য যে রক্ত নেওয়া হয়, এতে সওম ভঙ্গা হবে না। বরং এটা মাফ। কারণ, প্রয়োজনের তাগিদে রক্ত বের করতে হচ্ছে। [ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায]

গলা ও কণ্ঠনালী পরিষ্কার করার জন্য ঔষধ দিয়ে গড়গড়া করলে সওম ভঙ্গা হবে না, যদি তা গলার ভিতর না যায়।

দাঁত ছিদ্র করলে, বা দাঁত উপড়ে ফেললে, অথবা দাঁত পরিষ্কার করলে, বা মিসওয়াক করলে, কিংবা ব্রাশ ব্যবহার করলে যদি সেগুলোর কণা গিলে ফেলা থেকে বেঁচে থাকা যায়, তা হলে সওম ভঙ্গা হবে না। তদ্রূপ কেউ যদি দাঁতে কোনো ঔষধ ব্যবহার করে, এবং সেটার স্বাদ হলকে পাওয়া যায়, তা হলেও সওমের কোনো ক্ষতি হবে না।

কান পরিষ্কারের ঔষধ বা নাকের ঔষধ বা নাকের স্প্রে হলকে যাওয়ার পর সেগুলো না গিললে সওম ভঙ্গা হবে না।

দূরবীন বা স্প্রিং বা এ জাতীয় কিছু যদি জরায়ুতে প্রবেশ করানো হয়, বা যোনিপথে জরায়ুতে কিছু প্রবেশ করানো হয়, বা ডাক্তারি অনুসন্ধানের জন্য আঙ্গুল প্রবেশ করানো হয়, তা হলে সওম ভঙ্গা হবে না।

তদ্রূপ প্রস্রাবের থলি পরিষ্কার করার জন্য বা অন্য কোনো কারণে নারী বা পুরুষের প্রস্রাবের নালী দিয়ে যদি কোনো যন্ত্র ইত্যাদি প্রবেশ করানো হয়, তা হলেও সওম ভঙ্গা হবে না।

কুলকুচা বা গড়গড়া করলে বা মুখে ঔষধ স্প্রে করলে যদি তা গলায় না যায়, তা হলে সওম ভঙ্গা হবে না।

অক্সিজেন গ্যাস গলায় গেলে সওম ভঙ্গা হবে না।

দেহে মালিশ লাগালে বা ঔষধমিশ্রিত প্লাস্টার লাগালে সওম ভঙ্গা হবে না।

হার্ট বা অন্য কিছুর ছবি গ্রহণের জন্য বা চিকিৎসার জন্য শিরার ভিতর দিয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র ঢুকানো হয়, এর ফলে সওম ভঙ্গা হবে না। মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডে ঢুকালেও একই হুকুম-রোযা ভঙ্গা হবে না।

অন্ত্র পরীক্ষার জন্য দেহের চামড়া ভেদ করে যে দূরবীন ঢুকানো হয়, তাতে সওম ভঙ্গা হবে না। তবে পাকস্থলীতে যদি ঢুকানো হয়, আর তাতে কিছু মিশ্রিত থাকে তা হলে সওম ভঙ্গা হয়ে যাবে, নচেৎ হবে না।

কোনো নিষ্পাপকে বাঁচানোর জন্য যদি সওম ভঙ্গা করার প্রয়োজন হয়, যেমন ডুবন্ত ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য বা আগুন নেভানোর জন্য, তা হলে সওম ভঙ্গা করবে।

যে ব্যক্তি দুশমনের সাথে লড়াই করছে, বা দুশমন তাকে ঘিরে ধরেছে, আর সওম রাখলে যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়বে, তার জন্য সওম ভঙ্গা করা জায়েয, যদিও সে সফরে না থাকে। তদ্রূপ যুদ্ধের আগেও যদি সওম ভঙ্গোর প্রয়োজন হয়, তা হলে সওম ভঙ্গা করবে। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> তোমরা তোমাদের শত্রুপক্ষের কাছে যাচ্ছ। সওম না রাখলে অধিক শক্তি পাবে। কাজেই সওম ভঙ্গা করো। [সহিহ মুসলিম]

কেউ উযরবশত রামাদানে সওম রাখল না, যেমন সফর বা রোগের কারণে সওম রাখল না। মানুষের সামনে তার জন্য খাওয়া কি জায়েয হবে?

জবাব হল, যদি তার সওম ভাঙ্গার কারণটি সবার নিকট স্পষ্ট থাকে, যেমন অশীতিপর বৃদ্ধ, প্রকাশ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, তার জন্য লোকদের সামনে কিছু খাওয়াতে দোষ নেই। আর যার সওম না রাখার কারণ সবার জানা নেই, যেমন সফর, তা হলে উত্তম হল গোপনেই খাওয়া, যেন তার ব্যাপারে কারও কু-ধারণা সৃষ্টি না হয়।

মহিলাদের সওমের মাসআলা

স্বামী সাথে থাকলে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী নফল সওম রাখবে না। স্বামী সফরে চলে গেলে কোনো অসুবিধে নেই।

রাতের বেলায় হায়েয [মেয়েদের মাসিক] বা নেফাস [সন্তান প্রসবের পরে বের হোওয়া রক্ত] থেকে পবিত্র হল, এবং সওমের নিয়্যত করল। গোসল করার আগেই সূর্যোদয় হল। তার সওম শুদ্ধ হবে।

হায়েয বন্ধ করার ঔষধ ব্যবহার না করাই সমীচীন। উত্তম হল, স্বাভাবিক নিয়মে চলা, আল্লাহ ﷻ যা লিখে রেখেছেন, তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা। পরবর্তীতে হায়েযের সওমগুলোর কাজা রাখা। তা ছাড়া, হায়েযের প্রতিবন্ধক ঔষধ ব্যবহারে ক্ষতির দিকও আছে। অনেক মহিলাই এর ভুক্তভোগী। তারপরও কোনো মহিলা যদি এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করে সওম রাখে, তা হলে তার সওম আদায় হয়ে যাবে।

ইস্তিহাযার রক্তের ফলে সওমের কোনো ক্ষতি হবে না। [ইস্তিহাযা হল; মেয়েদের মাসিকের নির্দিষ্ট সময়ের পরে বের হওয়া রক্ত বা নেফাসের চল্লিশ পরে বের হওয়া রক্ত]

গর্ভপাত হল। সন্তান যদি পূর্ণাঙ্গ হয়, বা তার কোনো অঙ্গ প্রকাশ পায়, তা হলে গর্ভপাতের পরে যে রক্ত বের হবে, তা নেফাস হবে। আর যদি তা জমাটবন্ধ রক্ত বা মাংসপি- হয়, মানুষের কোনো অঙ্গ প্রকাশ না পায়, তা হলে সে রক্ত ইস্তিহাযা হবে। পারলে সওম রাখবে। নচেৎ সওম ভঙ্গ করবে। পরে তার কাজা রাখবে।

তদ্রূপ যদি অস্ত্রোপচার করে [পেট] পরিষ্কার করা হয়, এবং রক্ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে সওম রাখলে সওম শুদ্ধ হবে।

চল্লিশ দিনের আগেই নিফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। তা হলে সওম রাখবে এবং সালাত পড়বে। আবার যদি চল্লিশ দিনের মধ্যেই রক্ত আসে, তা হলে সওম রাখবে না। কারণ, এটা নিফাস। আর যদি চল্লিশ দিনের পরও চলতে থাকে, তা হলে সওম রাখবে এবং গোসল করবে। [এটা সকল ইমামের মত।] আর যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, সেটাকে ইস্তিহাযা ধরা হবে। তবে তা যদি হায়েযের সময়ের হয়, তা হলে সেটাকে হায়েয ধরা হবে।

দিনের বেলায় সওম রাখল। রাতে তার কাপড়ে রক্তের ফোঁটা দেখতে পেল। জানতে পারল না, সওম চলাকালে বেরিয়েছে, না কি পরে। তা হলে তার সওম শুদ্ধ হবে। [আল্লাজনাতুদ্দায়েমা]

গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণীর জন্য যদি সওম রাখা কষ্টকর হয়, তা হলে তাদের হুকুম পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির মত-প্রয়োজনের সময় সওম ভঙ্গা

করতে পারবে, এবং তাদের শুধু কাজা রাখতে হবে, চাই তাদের নিজেদের প্রাণের আশঙ্কা হোক বা সন্তানের। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন—

> আল্লাহ তাআলা মুসাফিরকে সওম থেকে দায়মুক্ত করে দিয়েছেন, এবং সালাত অর্ধেক করে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনণীকেও সওম থেকে দায়মুক্ত করে দিয়েছেন। [সুনানে তিরমিযি]

গর্ভবতী মহিলা সওম রাখল এবং তার রক্তস্রাব হল। তার সওম শুদ্ধ হবে। কারণ, এটা হায়েয নয়। [আল্লাজনাতুদ্দায়েমা]

রামাদানের সওমের কাজা আদায় করার আহকাম

সওম কাজা রাখার ব্যাপারে জলদি করা মুস্তাহাব। এতে তার জিম্মা থেকে মুক্ত হতে পারবে। বিরতিহীনভাবে কাজা রাখা জরুরি নয়। বিলম্ব করেও কাজা রাখা জায়েয আছে। কারণ, কাজার সময় প্রশস্ত। তবে আরেক রামাদানের পর পর্যন্ত বিলম্ব জায়েয হবে না। অবশ্য কোনো উযর থাকলে ভিন্ন কথা।

কেউ মারা গেল। তার জিম্মায় কিছু সওম আছে। তা হলে তার [নিকটবর্তী] অভিভাবকের জন্য মুস্তাহাব হল তার পক্ষ থেকে কাজা করা। কারণ, এক মহিলা এসে নবীজি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার মা মারা গেছেন। তার ওপর মান্নতের কিছু সওম আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে সওম রাখব?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

তার পক্ষ থেকে যদি তার অভিভাবক সওম না রাখে, তা হলে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে এক মিসকিনকে খাওয়াবে।

আল্লাহর অনুগত হয়ে সালাতে দাঁড়াও

আবু যুর'আ ﵀ এক মসজিদের ইমাম ছিলেন। বিশ বছর ধরে সেখানে সালাত পড়াচ্ছিলেন। তার নিকট হাদিস পড়ার জন্য একদিন কয়েকজন ছাত্র এল। মেহরাবের দিকে তাকিয়ে তারা সেখানে কিছু লেখা দেখতে পেল। তাকে বলল, 'মেহরাবে কিছু লেখার ব্যাপারে কী হুকুম?' তিনি বললেন, 'আগের দিনের অনেক আলেমই এটা অপছন্দ করেছেন। আর আমিও তা থেকে নিষেধ করি এবং অপছন্দ করি।' তারা বলল, 'ওই তো! আপনার মেহরাবেই তো লেখা দেখা যাচ্ছে। আপনি কি তা জানেন না?' তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! কী যে বলো! বান্দা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তার সামনে কী আছে, তা জানবে!'

শো'বা বিন হাজ্জাজ ﵀ সালাত লম্বা করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'যখনই আমি তাকে রুকু'তে দেখেছি, তার দীর্ঘ রুকু'র কারণে আমার ধারণা হয়েছে, তিনি কাওমা করতে ভুলে গেছেন। যখনই দুই সেজদার মাঝখানে বসেছেন, আমার মনে ধারণা জন্মেছে, পরের সেজদা করতে তিনি ভুলে গেছেন।'

উবাইদা বিন মুহাজির অনেক বড় আবেদ ছিলেন। আল্লাহ ﷻ-র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা সব সময় আদায় করতেন। বিনয়ী ও যিকিরকারী ছিলেন। তার মা ছিলেন অগ্নিপূজক। মায়ের সাথে অত্যন্ত সৎ ব্যবহার

করতেন। তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। একদিন আসরের সালাত থেকে এলে তার মা তাকে সুসংবাদ শোনালেন-তিনি মুসলমান হয়েছেন, কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করেছেন। এতে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। কান্নাকাটি করতে লাগলেন। যখন মাথা তুললেন, ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে।

হাফসা বিনতে সিরিন রাতের বেলায় বাতি জ্বালিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। কাছেই কাফন রেখে দিতেন, যেন মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় এবং অন্তর বিগলিত হয়।

হজ্জের আহকাম

বাইতুল্লায় হজ্জ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

বাইতুল্লাহ যেতে সক্ষম ব্যক্তির ওপর আল্লাহর জন্য হজ্জ করা আবশ্যক। [সূরা আলে ইমরান : আয়াত : ৯৭]

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> ইসলামের ভিত্তি হল পাঁচটি-এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসুল; সালাত কায়েম করা; যাকাত আদায় করা; রামাদানের সওম রাখা এবং বাইতুল্লাহর হজ্জ করা, সেখানে যেতে যে সক্ষম, তার জন্য। [সহিহ বুখারি]

নবীজি ﷺ আরও বলেছেন–

> হজ্জ ও উমরার একটির পর আরেকটি করতে থাকো। কারণ, এ দুটি দারিদ্র ও গোনাহ এমনভাবে দূর করে, যেমনভাবে হাপর লোহা, সোনা ও রূপার ময়লা দূর করে। আর মবরূর হজ্জের একমাত্র সওয়াব হল জান্নাত। [সুনানুত তিরমিযি]

কেউ হজ্জ করার সিদ্ধান্ত নিলে সে যাদের ওপর জুলুম করেছে, তাদেরকে তার বদলা দিয়ে দেবে, কারও আমানত থাকলে পৌঁছিয়ে দেবে, ঋণ থাকলে পরিশোধের ব্যবস্থা করবে, ওসিয়্যত লিখে রাখবে,

কারও হক আদায় করতে সমর্থ না হলে কাউকে সে দায়িত্ব অর্পণ করবে, এবং সন্তানাদির জন্য হালাল রিযিকের নিরাপদ ব্যবস্থা করবে।

পাঁচটি শর্ত পাওয়া গেলে হজ্জ ফরজ হয়-ইসলাম, জ্ঞানশক্তি, স্বাধীনতা, প্রাপ্তবয়স্কতা ও সক্ষমতা। যার মধ্যে এই পাঁচটি বিষয় পাওয়া যাবে, তার ওপর জলদি করে হজ্জ করা ফরজ।

সক্ষমতা বলতে বোঝায় মুসলমান ব্যক্তি দৈহিকভাবে সুস্থ হওয়া, তার অবস্থা অনুযায়ী মক্কা যাওয়ার মত যোগাযোগব্যবস্থা থাকা, আসা-যাওয়ার পাথেয় থাকা, এবং যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার ওপর, তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা থাকা। মহিলাদের জন্য আরেকটি শর্ত আছে-তার সাথে তার মাহরাম থাকা।

সামর্থ্যবান মুসলমান ব্যক্তির ওপর জীবনে এক বার হজ্জ করা ফরজ।

মিকাত পাঁচটি

যুলহুলাইফা : এটা মক্কা হতে ৪২৮ কি.মি. দূরে।

জুহফা : এটা লোহিত সাগর থেকে ১০ কি.মি. দূরের একটি গ্রাম। বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত। আজকাল মানুষ ' রাবেগ' থেকে ইহরাম বাঁধে। এটি মক্কা হতে ১৮৬ কি.মি. দূরে।

ইয়ালামলাম : এটি একটি উপত্যকা। মক্কা হতে দক্ষিণে ১২০ কি. মি. দূরে অবস্থিত। আজকাল মানুষ সা' দিয়া গ্রাম থেকে ইহরাম বাঁধে।

কারনুল মানাযেল : এর বর্তমান নাম আস্‌সাইলুল কবির। এটি তায়েফে অবস্থিত। মক্কা হতে প্রায় ৭৫ কি.মি. দূরে।

যাতু ইরক : একে ' যারিবা' বলা হয়। মক্কা হতে ১০০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। বর্তমানে পরিত্যক্ত। কারও আসা-যাওয়া নেই।

আর যার বসতবাড়ি এর ভিতর, মক্কার আরও নিকটবর্তী, সে তার বাড়ি থেকেই হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে। মক্কাবাসীরা তাদের ঘরেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। হজ্জের ইহরামের জন্য মিকাতে যাওয়া জরুরি

নয়। তবে উমরার ইহরামের জন্য হিল্ল-এর নিকটে যাবে। অর্থাৎ তান'য়িম, আরাফা ইত্যাদি।

তদ্রূপ যে ব্যক্তি বিমানযোগে আসবে, বিমানে ওঠার আগেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রস্তুতি নিয়ে নেবে। যখন আকাশপথে মিকাত বরাবর আসবে, তখন ইহরামের নিয়্যত করবে, এবং তালবিয়া পড়বে। বিমান জিদ্দায় অবতরণ করা পর্যন্ত ইহরাম বিলম্ব করা জায়েয হবে না। কারণ, তা মিকাত নয়।

কেউ যদি ইহরাম ছাড়াই মিকাত অতিক্রম করে ফেলে, মিকাতে ফিরে এসে ইহরাম বাঁধা তার ওপর জরুরি। যদি মিকাতে ফিরে না এসেই ইহরাম বেঁধে নেয়, তা হলে তার ওপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে। একটি বকরি জবাই করে হারামের মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে, নিজে কিছুই খাবে না।

ইহরামের পদ্ধতি

ইহরাম হল হজ্জের নিয়্যত করা। একে ইহরাম বলার কারণ হল, হজ্জ ও উমরার ইহরাম দ্বারা ইহরামের আগে যা হালাল ছিল, যেমন বিবাহ, সুগন্ধ ব্যবহার, নখ কাটা, মাথা ছাঁটা ইত্যাদি, সেগুলো হারাম করে নেওয়া হয়। [ইহরাম অর্থ নিষিদ্ধ করা, বিরত থাকা]

ইহরামের আগের মুস্তাহাব

এক. গোসল করা। পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য এবং দুর্গন্ধ দূর করার জন্য গোসল করবে। এ কারণে ঋতুমতী ও নিফাস অবস্থায় আছে, এমন নারীর জন্যও তা মুস্তাহাব। কারণ, নবীজি ﷺ আসমা বিনতে উমাইস (রা.)-কে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ তিনি তখন নিফাস অবস্থায় ছিলেন। [সহিহ মুসলিম]

আর আয়েশা (রা.)-কে হজ্জের ইহরামের জন্য গোসলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন তিনি ঋতুমতী ছিলেন।

দুই. অতিরিক্ত চুল দূর করা। যেমন গোঁফ কাটা, বগলের নীচের ও নাভির নীচের পশম দূর করা।

তিন. দেহে সুগন্ধ লাগানো। আয়েশা ﵂ বলেন, ইহরাম বাঁধার পূর্বে ইহরামের জন্য এবং তাওয়াফ করার পূর্বে হালাল হওয়ার জন্য আমি রাসুল ﷺ-কে সুগন্ধ লাগিয়ে দিতাম। [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

চার. সাধারণ পোশাক খুলে সাদা ও পরিষ্কার ইজার ও চাদর পরিধান করবে। তবে সাদা না হলেও জায়েয হবে।

মহিলাদের জন্য পোশাকের ক্ষেত্রে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। তাদের আবৃত করে, এমন যে কোনো পোশাকই তারা পরিধান করতে পারবে। তবে তাতে সৌন্দর্যপ্রদর্শন বা পুরুষের সাদৃশ্য থাকতে পারবে না। আর পোশাকের রঙের ব্যাপারেও কোনো শর্ত নেই। তবে নেকাব [যা দিয়ে মুখ ঢেকে ও চোখ খুলে রাখা হয়] ব্যবহার করতে পারবে না। তদ্রূপ হাতমোজাও ব্যবহার করবে না। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন—

> মুহরিমা মহিলা নিকাবও ব্যবহার করবে না, মোজাও ব্যবহার করবে না। [সহিহ বুখারি]

তবে তারা নিকাব ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে পরপুরুষ থেকে তাদের চেহারা ঢেকে রাখবে। যেমন একটুকরো কাপড় মুখের সামনে ঝুলিয়ে দেবে। আসমা বিনতে আবু বকর ﵄ বলেন, 'ইহরামের সময় আমরা পুরুষদের থেকে আমাদের চেহারা ঢেকে রাখতাম।' [হাকেম। তিনি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।]

এরপর মনে মনে উমরার নিয়্যত করবে। আর যা নিয়্যত করবে, তা উচ্চারণ করবে; বলবে—

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْعُمْرَةِ

সওয়ারির ওপর [গাড়ি ইত্যাদির ওপর] ভালভাবে বসার পর নিয়্যত উচ্চারণ করা উত্তম।

আর যদি হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চায়, তা হলে যে প্রকারের হজ্জ করবে, সে অনুসারে তালবিয়া পড়বে।

হজ্জ তিন প্রকার

তামাত্তু' : হজ্জে তামাত্তু'র মধ্যে হজ্জের মাসে [শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জের দশ দিন] প্রথমে উমরার নিয়্যত করবে। উমরা আদায় করার পর ইহরামের পোশাক খুলে ফেলবে, এবং হালাল হবে। এরপর যখন হজ্জের সময় হবে, তখন হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে।

ইফরাদ : ইফরাদ হল মিকাত থেকে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধা। হজ্জের আহকাম শেষ করা পর্যন্ত ইহরামের ওপর থাকবে।

ক্বিরান : উমরা ও হজ্জ, দুটোর জন্য একসাথে ইহরাম বাঁধা। অথবা প্রথমে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা, এরপর উমরার তাওয়াফ শুরু করার আগেই তার সাথে হজ্জ মিলিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ মিকাতের মধ্যে অথবা উমরার তাওয়াফ শুরু করার আগে উমরা ও হজ্জ দুটোরই নিয়্যত করবে। আর দুটোর জন্য তাওয়াফ ও সা'য়ি করবে।

হজ্জে ক্বিরান ও হজ্জে তামাত্তু' পালনকারী যদি মসজিদে হারামের অধিবাসী না হয়, তা হলে একটি হাদি জবাই করবে।

এই তিন ধরনের হজ্জের মধ্যে সর্বোত্তম হল হজ্জে তামাত্তু'। এ ব্যাপারে অনেক প্রমাণ আছে। বিস্তারিত আলোচনার দিকে না গিয়ে সেগুলো আমি সামনে ব্যাখ্যা করব।

উমরার সময় এ বলে ইহরাম বাঁধবে : لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً। আর যদি হজ্জের ইহরাম হয়, তা হলে বলবে : لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ حَجًّا।

ইহরামের জন্য দু' রাকআত সালাত পড়তে হবে, এমন কোনো বিধান নেই। তবে যদি ফরজ সালাতের পর ইহরাম বাঁধে, তা হলে উত্তম। কারণ, নবীজি ﷺ এরূপ করেছেন। [সহিহ মুসলিম]

আকাশপথে যাওয়ার সময় মিকাত বরাবর গেলেই ইহরাম বাঁধবে।

যদি কেউ পীড়াগ্রস্ত হয়, বা তার কঠিন কোনো উযর থাকে, যার কারণে হজ্জ বা উমরা পূর্ণ করার ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করে, তা হলে নিয়্যতের শব্দ বলার পর বলবে–
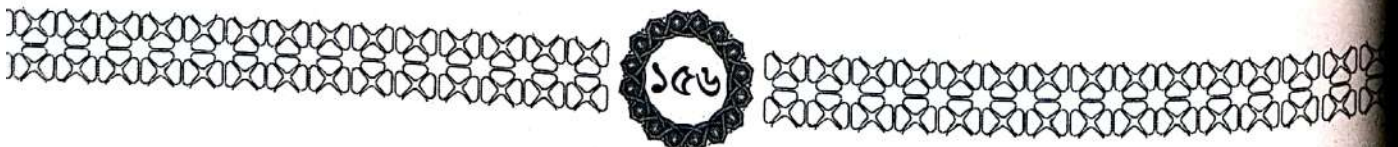
إِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

মানে, কোনো বাধা এলে, যেখানে বাধা আসবে, সেটাই আমার হালাল হওয়ার জায়গা।

এ কথা বলার লাভ হল, যদি কোনো বাধা এসে দাঁড়ায়, তা হলে কোনো ফিদয়া ছাড়াই উমরা থেকে হালাল হতে পারবে।

ইহরাম বাঁধার পর বেশি বেশি তালবিয়া পড়া সুন্নাত। তালবিয়া হল–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

পুরুষরা উচ্চ স্বরে বলবে, আর মহিলারা বলবে নীচু স্বরে।

গাধাকে ঘাস খাওয়াও

সুফয়ান সওরি ﷬-র ঘটনা। তার ছাত্র আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন, " একবার সুফয়ান সওরি রহ. ইশার সালাতের পর আমার নিকট আগমন করলেন। তার সামনে রাতের খাবার পেশ করলাম। কিশমিশ ও বাদামও সামনে রাখলাম। তিনি বেশ খেলেন। খানা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। অযু করলেন। এরপর কোমরে ভালভাবে ইজার বাঁধলেন। ক্বিবলামুখী হলেন। বললেন, 'আব্দুর রাজ্জাক! লোকে বলে, গাধাকে খাওয়াও। এরপর তাকে দিয়ে পরিশ্রম করাও'। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। সকাল পর্যন্ত সালাত পড়লেন।"

ইবনে ওহব ﷬ বলেন, 'সুফয়ান সওরি ﷬-কে একবার আমি হারামে দেখেছিলাম। মাগরিবের পর সালাত পড়লেন। এরপর সেজদায় গেলেন। ইশার আযানের আগে আর মাথা তুলেননি।'

আবু মুসলিম খাওলানি ﵀ একরাত সালাতে দাঁড়ালেন। তার পা-দুটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ছড়ি দিয়ে সেগুলোকে প্রহার করতে করতে বলতে লাগলেন, ' রাসুলে ﷺ-এর সাহাবিগণ ধারণা করছেন, তারা আমাদের আগে চলে যাবেন? খোদার কসম! আমরা তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করব, যেন তারা জানতে পারেন, তাদের পিছনে কিছু যোগ্য লোক রেখে গেছেন।'

উমরা আদায়ের নিয়ম

হারামে প্রবেশ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবে। সেখানে প্রবেশ করলে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে। ইহরামের কাপড় পেঁচিয়ে নেবে। [ডান কাঁধ খোলা রাখবে এবং বাম কাঁধ ঢেকে রাখবে।] এরপর ডান হাত দিয়ে হজরে আসওয়াদের ইসতিলাম করবে। [অর্থাৎ মাসেহ করবে।] এবং আল্লাহু আকবার বলে সেটাকে চুমু খাবে। ভিড়ের কারণে চুমু দিতে না পারলে হাত দিয়ে ইসতিলাম করবে এবং হাতে চুমু খাবে। এটাও যদি পারা না যায়, তা হলে হাতের লাঠি ইত্যাদি দিয়ে ইসতিলাম করবে, এবং সেটাকে চুমু দেবে।

এটাও যদি সম্ভব না হয়, তা হলে সেটার দিকে দেহ ফিরিয়ে ডান হাত দিয়ে ইশারা করবে। তবে আল্লাহু আকবার বলে সেটাকে চুমু দেবে না।

এরপর সাত বার কা'বার তাওয়াফ করবে। প্রতিটি তাওয়াফ শুরু হবে হজরে আসওয়াদ থেকে, এবং শেষও হবে সেখানে। সেটার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সেটাকে চুমু খাবে এবং তাকবির বলে ইসতিলাম করবে। তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে চুমু ছাড়া তাকবির বলে হাত দিয়ে ইশারা করবে, যেমনটা আগে বলা হয়েছে। সপ্তম চক্করের শেষেও এটা করবে।
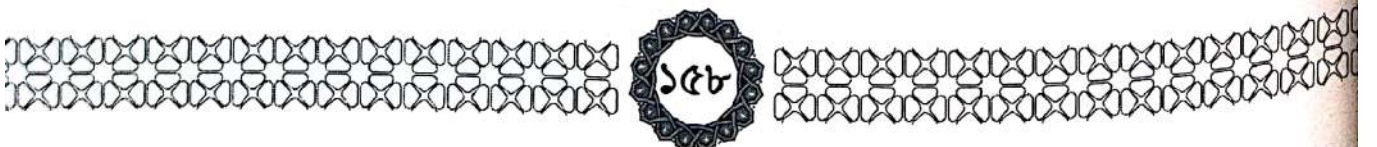
আর যখনই রুকনে-ইয়ামানি দিয়ে অতিক্রম করবে, ডান হাত দিয়ে তাকবির ছাড়া ইসতিলাম করবে। ভিড়ের কারণে যদি ইসতিলাম করা না যায়, তা হলে ইশারাও করবে না, তাকবিরও বলবে না, বরং তাওয়াফ করে যাবে।

রুকনে-ইয়ামানি ও হজরে আসওয়াদের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় এ দোয়া পড়া মুস্তাহাব–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

তাওয়াফের জন্য বিশেষ কোনো দোয়া নির্ধারিত নেই। তাই যদি তাওয়াফকারী কুরআন পাঠ করতে থাকে, বা দোয়া করতে থাকে বা আল্লাহ ﷻ-র যিকির করতে থাকে, কোনো ক্ষতি নেই।

তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে পুরুষের জন্য রমল করা সুন্নাত। রমল হল, ছোট ছোট কদমে দ্রুত হাঁটা।

পবিত্রতা সহকারে তাওয়াফ আদায় করা উচিত।

তাওয়াফের চক্করের সংখ্যায় যদি সন্দেহ দেখা দেয়, তা হলে নিশ্চিতটাই ধরবে, অর্থাৎ কমটা। যেমন সন্দেহ হল, তিন চক্কর হল, না কি চার চক্কর। তা হলে তিন চক্করই ধরে নিয়ে সাত চক্কর পুরো করবে। এটাই সতর্কতার দাবি।

তাওয়াফ শেষ করার পর মাকামে ইবরাহিমের দিকে মুখ ফেরাবে এবং এই আয়াত পাঠ করবে–

﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى﴾ [১]

এরপর ইহরামের চাদর খুলে তা দিয়ে উভয় কাঁধ ঢেকে নেবে এবং তার পিছনে দু' রাকআত সালাত পড়বে। প্রথম রাকআতে পড়বে সূরায়ে কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে ইখলাস। ভিড়ের কারণে যদি মাকামে ইবরাহিমের পিছনে সালাত পড়া না যায়, তা হলে হারামের যেখানে পারা যায়, পড়ে নেবে। এরপর যমযমের পানি পান করবে। এটা মুস্তাহাব। এরপর সম্ভব হলে হজরে আসওয়াদের ইসতিলাম করবে।

এরপর সা'য়ির জায়গায় যাবে। সা'য়ি শুরু করবে সাফা থেকে। সেখানে গিয়ে সর্বপ্রথম এ আয়াত পাঠ করবে–

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾.

আর বলবে, আমরা তা থেকেই শুরু করছি, যা দিয়ে আল্লাহ ﷻ শুরু করেছেন। এরপর সাফার ওপর উঠবে। ক্বিবলার দিকে ফিরবে, হাত উঠাবে এবং এ বলে দোয়া করবে–

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه ، أَنْجَزَ وَعْدَه ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

এরপর মনে যে দোয়া আসে, পড়বে। এরপর আবার আগের যিকিরটি পড়বে। এরপর আবার দোয়া পড়বে। এরপর আবার ওই যিকিরটি পড়বে। এরপর হাত নামিয়ে মারওয়ার দিকে হাঁটতে থাকবে। সবুজ দুটি চিহ্নের মাঝখানে দ্রুত চলবে। মারওয়া পৌঁছার পর সাফাতে যা যা করেছে, সেখানেও তা তা করবে। অর্থাৎ ক্বিবলার দিকে ফিরবে এবং দোয়া করবে। প্রত্যেকবারের শুরুতে এরূপ করবে। সপ্তমবারের শেষে দোয়া করবে না।

সা'য়ির সময়ের জন্য বিশেষ কোনো যিকির নির্দিষ্ট নেই। তবে আল্লাহ ﷻ-র যিকির করতে থাকবে এবং মনের চাহিদামত দোয়া করতে থাকবে। আর কুরআন পাঠ করলেও ক্ষতি নেই। পবিত্র অবস্থায় সা'য়ি করা মুস্তাহাব। সা'য়ি করার সময় সালাত শুরু হলে সা'য়ি বন্ধ করে সালাত আদায় করে নেবে। সালাত শেষ করে সা'য়ি পূর্ণ করবে।

সা'য়ি শেষ করার পর মাথা হলক করবে অথবা চুল ছোট করবে। যদি হজ্জের কাছাকাছি সময় হয়, তা হলে মাথা হলক করা থেকে কসর করা, মানে, চুল ছোট করা উত্তম। তা হলে হজ্জের সময় মাথা হলক করা যাবে। আর যদি শুধু উমরা হয়, তা হলে হলক করা উত্তম।

চুল ছোট করার সময়, মাথার একদিকের নয়, পুরো মাথার চুল ছোট করবে।
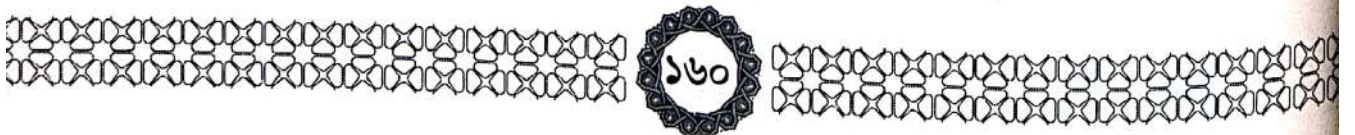
মেয়েরা তাদের মাথার চুলের আগার দিক থেকে আঙ্গুলের মাথার পরিমাণ, যা মোটামুটি এক সেন্টিমিটার হয়, ছোট করবে। তা-ও পুরো মাথার চুল থেকে করতে হবে। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> মেয়েদের মাথা হলক করবে না। বরং তারা চুল ছোট করবে। [আবু দাউদ]

হলক করা হলে বা চুল ছোট করা হলে উমরার কার্যক্রম শেষ হবে।

হজ্জ শুরু

তারবিয়ার দিন ৮ই যিলহজ্জ

এই দিন হাজিরা ইহরাম বাঁধবে। যে যেখানে আছে, সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে। এর আগে গোসল করে নেবে। এরপর সুগন্ধ ব্যবহার করবে। এরপর চাশতের সময় মিনা যাবে। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করবে। প্রতিটি সালাত সময়মত পড়বে এবং চার-রাকআতবিশিষ্ট সালাত দু' রাকআত পড়বে। [অর্থাৎ যোহর, আসর ও ইশা দু' রাকআত করে পড়বে।] এরপর মিনায়ই রাত্রিযাপন করবে।

আরাফার দিন ৯ই যিলহজ্জ

আরাফার দিন সূর্যোদয় হলে আরাফার দিকে রওয়ানা করবে। যোহর ও আসর কসর করবে এবং যোহরের সময় একসাথে পড়বে। হাজি সাহেবদের জন্য মুস্তাহাব হল আরাফার পাহাড়ের পিছনে ক্বিবলার দিকে ফিরে অবস্থান করা। কারণ, নবীজি ﷺ এখানেই অবস্থান করেছিলেন। যথাসাধ্য বেশি বেশি যিকির, দোয়া ও ইসতিগফার করতে

থাকবে। সওয়ার অবস্থায় হোক বা পদাতিক অবস্থায়, স্থির অবস্থায় হোক বা চলমান অবস্থায়, বসে হোক বা শুয়ে সর্বাবস্থায় এসব কাজে নিজেকে লাগিয়ে রাখবে। তবে হাদিসে যেসব দোয়ার কথা বর্ণিত আছে, সেগুলো পড়া উত্তম। কারণ, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

সর্বোত্তম দোয়া হল আরাফার দিনের দোয়া; আর আমি ও আমার পূর্বেকার নবীরা যা বলেছেন, তার মধ্যে সর্বোত্তম হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه ، لَا شَرِيْكَ لَه ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ [সুনানে তিরমিযি]

আরাফার দিন হল একটি মহান দিন। এই দিনে আল্লাহ ﷻ জাহান্নাম হতে যতজনকে মুক্তি দেন, অন্য কোনো দিনে ততটা দেন না। আর এই দিনে শয়তানকে যতটা ক্ষুদ্র ও লাঞ্ছিত দেখা যায়, অন্য কোনো দিনে ততটা দেখা যায় না। কারণ, এই দিনে শয়তান বান্দাদের ওপর আল্লাহ ﷻ-র রহমতরাজি নাযিল হতে দেখে। তাই হাজিদের উচিত, যতটা পারা যায়, কান্নাকাটি করা, বিনয় প্রকাশ করা এবং দোয়া করা।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করবে। সূর্যাস্তের পূর্বে সেখান থেকে ফেরা জায়েয হবে না। যদি কেউ বেরিয়ে যায়, তা হলে আরাফায় আবার ফিরে যেতে হবে, যেন সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে থাকা যায়। ফিরে না গেলে একটি ফিদয়া জবাই করতে হবে। কারণ, একটি ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আরাফায় অবস্থানের সময় শুরু হয় আরাফার দিনের যোহরের সময় থেকে। দশ তারিখের ফজরের সময় হওয়া পর্যন্ত তা বাকি থাকে। কেউ যদি দিনের বেলায় সেখানে অবস্থান করে, তাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। আর কেউ যদি সামান্য সময়ের জন্য হলেও রাতে অবস্থান করে, তার হজ্জ শুদ্ধ হবে। কারণ, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

কেউ যদি রাতে আরাফায় অবস্থান করে, সে হজ্জ পেল। [দারাকুতনি, তিরমিযি]

আরাফায় অবস্থান করা হজ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, ' হজ্জ হল আরাফা।' [বুখারি, মুসলিম]

আরাফা হতে মুযদালিফায় গমন এবং সেখানে রাত্রি যাপন

সূর্যাস্তের পর হাজিরা আরাফা হতে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। কারণ, নবীজি ﷺ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করেছিলেন। আর যখন তিনি আরাফা ত্যাগ করেছিলেন, তখন তার উটকে লাগাম পরানো হয়েছিল, যার ফলে সেটার মাথা জিনের পাদানি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। আর তিনি ডান হাত দিয়ে ইশারা করছিলেন; বলছিলেন, ' লোকেরা! স্থির হও! স্থির হও!' [সহিহ মুসলিম]

রাস্তায় চলার সময় বেশি বেশি তালবিয়া ও ইসতিগফার পড়তে থাকবে।

মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও ইশা একসাথে পড়বে। ইশার সালাতে কসর করবে। উভয় সালাতের জন্য আযান একটি হবে। আর প্রত্যেক সালাতের জন্য একটি করে মোট দুটি ইকামত হবে। তা পড়বে সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে, বিলম্ব না করে। যদি অর্ধরাতের আগেই সেখানে পৌঁছনো না যায়, তা হলে ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পথেই মাগরিব ও ইশা পড়ে নেবে।

এরপর রাত্রে সেখানেই থাকবে। ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই ফজরের সালাত পড়ে নেবে। এরপর আলোকিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকবে। এরপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার উদ্দেশে রওয়ানা হবে।

যদি কেউ দুর্বল হয়, যেমন নারী, শিশু ইত্যাদি, তা হলে তার জন্য রাতের অর্ধেক পেরিয়ে গেলেই মুযদালিফা হতে রওয়ানা হওয়া জায়েয আছে। ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার জন্য জরুরি নয়।

তদ্রূপ এ ধরনের দুর্বলদের সাথে কোনো অভিভাবক থাকলে তার জন্যও দুর্বলদের সাথে অর্ধরাতের পর মুযদালিফা হতে মিনার উদ্দেশে

রওয়ানা হওয়া জায়েয আছে। তবে শক্তি-সামর্থ্যবান, যাদের সাথে এ ধরনের কোনো দুর্বল নেই, তাদের জন্য ফজরের সময় পর্যন্ত থাকাটাই সমীচীন। ফজরের সালাতের পর তারা সেখান থেকে রওয়ানা হবে। আর সালাতের পর বেশি বেশি দোয়া ও যিকির করতে থাকবে, চারিদিক আলোকিত হওয়া পর্যন্ত। এরপর মিনার উদ্দেশে রওয়ানা হবে, এবং চলার পথে অধিক হারে তালবিয়া পড়তে থাকবে।

মুযদালিফায় রাত্রিযাপন হজ্জের একটি ওয়াজিব। অর্ধরাতের আগে যে সেখানে পৌঁছয়, তার জন্য তা ত্যাগ করা জায়েয হবে না। অর্ধেক রাত পেরিয়ে যাওয়ার পর সেখানে পৌঁছলে সেখানে সামান্য সময় অবস্থান করলেও চলবে। তবে উত্তম হল, ফজরের সালাত পড়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা।

যাদের উযর আছে, তাদের জন্য রাত্রে মুযদালিফায় অবস্থান না করার অনুমতি আছে। যেমন এমন পীড়িত ব্যক্তি, যাকে হাসপাতালে ভর্তি করা জরুরি।

দশ তারিখ [কুরবানির দিন, ঈদের দিন]

সূর্যোদয়ের ক্ষণিক পূর্বে মুযদালিফা হতে মিনার উদ্দেশে রওয়ানা হবে। আর মিনায় পৌঁছার পূর্বে পথ থেকেই জিমারের জন্য পাথরকণা সংগ্রহ করে নেবে। এটাই উত্তম। আর যদি মুযদালিফা বা মিনা থেকে সংগ্রহ করে, তা হলেও জায়েয হবে। পাথরকণাগুলো নখের সমান হবে। মানে, ছোলাবুট থেকে সামান্য বড় হবে।

প্রথমে জামরায়ে আকাবায় যাবে। এটাকে জামরায়ে কুবরাও বলা হয়। একটা একটা করে সাতটা পাথরকণা নিক্ষেপ করবে। আর তা করবে সূর্যোদয়ের পর। মাগরিবের সময় থাকা পর্যন্ত তা করা যায়। যদি রাতে নিক্ষেপ করে, তা হলেও জায়েয হবে। এগারো তারিখ ফজরের সময় এর ওয়াক্ত শেষ হয়।

জামরার জন্য যে হাউজ বানানো আছে, পাথরকণা সেখানে পড়া চাই, পরে সেখানে স্থির থাকুক বা না থাকুক। স্থির না থাকলে তাতে

কোনো ক্ষতি নেই। তাই হাজি সাহেবদের জন্য জরুরি হল সঠিকভাবে জামরার হাউজে পাথরকণা নিক্ষেপ করা। যে খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটাতে মারার কোনো অর্থ নেই। এই খুঁটি রাখা হয়েছে চিহ্ন হিসেবে, পাথরকণা মারার জন্য নয়। কাজেই কেউ যদি খুঁটিতে পাথরকণা নিক্ষেপ করে, আর তা হাউজে না পড়ে অন্যত্র চলে যায়, তা হলে জায়েয হবে না। আর যদি খুঁটিতে আঘাতের পর হাউজে পড়ে, পরবর্তীতে সেখানে থাকুক বা না থাকুক, তার পাথরকণা নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে।

দুর্বলরা মুযদালিফার রাতের অর্ধেকের পর রমিয়ে জিমার করবে। দুর্বলরা ছাড়া অন্যরাও যদি করে, তা হলে আদায় হয়ে যাবে। তবে তা অনুত্তম হবে।

মিনা পৌঁছার পর রমিয়ে জিমারের আগে কিছু না করা সুন্নাত। কারণ, এটা মিনার সম্মানার্থে হচ্ছে। প্রত্যেক বার নিক্ষেপের সময় তাকবির বলা মুস্তাহাব। বলবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَغْفُوْرًا

> হে আল্লাহ! হজ্জটিকে কবুল করো এবং গোনাহ মাফ করো। [মুসনাদে আহমদ]

কুরবানির দিন জমরায়ে আক্বাবা ছাড়া অন্য কোনো রমি করবে না।

ক্বিরান ও তামাত্তু' হজ্জকারী রমি করার পর হাদি জবাই করবে। সেখান থেকে নিজেও খাবে, দানও করবে। জবাইয়ের সময় থাকে ১৩ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আর রাতেও জবাই করা যাবে। তবে ঈদের দিন রমিয়ে জিমারের পর পরই জবাই করা উত্তম। কারণ, নবীজি ﷺ এরূপ করেছেন।

হাজির যদি হাদি কেনার সামর্থ্য না থাকে, তা হলে হজ্জের সময় তিন দিন সওম রাখবে। সে-দিনগুলো ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ হওয়া উত্তম। আর নিজ শহরে এসে সাত দিন সওম রাখবে।

এরপর মাথা মুণ্ডন করবে বা চুল ছাঁটাই করবে। তবে মুণ্ডন করাই উত্তম। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–
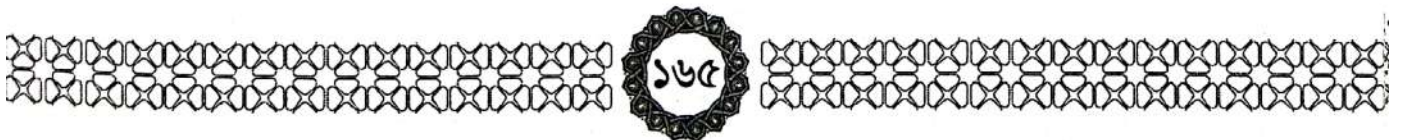
﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾

যারা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করে বা চুল ছাঁটাই করে। [সূরা ফাতাহ : আয়াত ২৭]

আর নবীজি ﷺ হলককারীদের জন্য তিন বার দোয়া করেছেন, এবং চুল ছাঁটাইকারীদের জন্য এক বার দোয়া করেছেন।

আর চুল ছাঁটাই করার সময় পুরো মাথার চুলই ছাঁটাই করতে হবে। কিছু অংশের করলে হবে না। কারণ, আয়াতে হলক ও কসর করার ব্যাপারে পুরো মাথার কথা বলা হয়েছে।

টাকমাথা, যার মাথায় চুল নেই, সে তার মাথার ওপর ক্ষুর চালাবে। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ করলে যতটা পারো পালন করো।' [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

মহিলারা তাদের চুলের আগার দিক থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ কাটবে। যদি বেণী বাঁধা না থাকে, পুরো চুল একত্রিত করে চারদিক থেকে কেটে দেবে।

রমি ও হলক বা কসরের পর মুহরিমের জন্য সুগন্ধ, পোশাক ইত্যাদি ব্যবহার জায়েয হবে, তবে নারী নয়। এটা হল প্রথম হালাল হওয়া, যার ফলে তার জন্য স্ত্রী ছাড়া সবকিছু জায়েয হবে।

এরপর তাওয়াফে ইফাযা করার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে এবং হারামের দিকে যাবে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾

এরপর তারা যেন তাদের দেহের ময়লা দূর করে, এবং তাদের মান্নত পূর্ণ করে, এবং এই প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে। [সূরায়ে হজ্জ : আয়াত ২৯]

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, 'হালাল হওয়ার জন্য আমি রাসুল ﷺ-কে বাইতুল্লাহর তাওয়াফের আগে সুগন্ধ লাগিয়ে দিতাম।'

এই তাওয়াফের পর হজ্জের সা'য়ি করবে।

আর এই তাওয়াফের পর হাজির জন্য, ইহরামের কারণে যা কিছু হারাম হয়েছিল, সব হালাল হবে, এমনকি স্ত্রীও। এটাকে বলা হয় দ্বিতীয় বার হালাল হওয়া, বা পূর্ণরূপে হালাল হওয়া।

উত্তম হল, রমি, হলক বা কসর এবং তাওয়াফে ইফাযা, এই তিনটি কাজ ধারাবাহিকভাবে আদায় করা। তবে, যদি আগ-পর করা হয়, তা হলেও কোনো ক্ষতি নেই। এই তিনটি কাজের দুটি করলেই প্রথম বার হালাল হবে। আর কাজ-তিনটি করার পর দ্বিতীয় বার হালাল হবে। তাই কাজ-তিনটি আদায় করার পরই তার জন্য সবকিছু জায়েয হবে।

হজ্জের তাওয়াফ ও সা'য়ির নিয়ম উমরার তাওয়াফ ও সা'য়ির মত, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

তাশরিকের দিনগুলো [১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ]

ঈদের দিন তাওয়াফে ইফাযার পর মিনা ফিরে যাবে। রাত্রি অবশ্যই সেখানে যাপন করতে হবে। কারণ, নবীজি ﷺ কাউকে মক্কায় থাকার অনুমতি দেননি। শুধু আব্বাস رضي الله عنه-কে লোকদের পানি পান করানোর স্বার্থে অনুমতি দিয়েছিলেন। [ইবনে মাজা]

তাই তিন রাত মিনায় অবস্থান করবে [একাদশ তারিখের রাত (দশ তারিখ দিবাগত রাত), দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ তারিখের রাত]। এই তিন রাত সেখানে অবস্থান করবে, যদি তাড়া না থাকে। আর তাড়া থাকলে দু' রাত অবস্থান করবে। মিনায় সালাত কসর করবে। তবে জমা' বাইনাস্‌সালাতাইন করবে না, অর্থাৎ একই ওয়াক্তে দু' ওয়াক্তের সালাত পড়বে না। বরং প্রত্যেক সালাত নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করবে।

তাশরিকের তিন দিনই সূর্য ঢলে যাওয়ার [যোহরের আযানের] পর রমিয়ে জিমার করবে। ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বলেন, ' আমরা অপেক্ষা করতাম। সূর্য হেলে পড়লে আমরা রমি করতাম।' [সহিহ বুখারি]

হাদিস শরিফে نَتَحَيَّنُ শব্দ এসেছে। যার অর্থ হল, আমরা সূর্যের দিকে লক্ষ রাখতাম। যোহরের সময় হলে আমরা রমি করতাম।

তা ছাড়া, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, ' আমার থেকে তোমাদের হজ্জের আহকাম শিখে নাও।' [সহিহ মুসলিম]

এগারো তারিখ ও এর পরের দিনগুলোয় রমির সময় শুরু হবে সূর্য ঢলে পড়ার পর। এর আগে রমি করলে শুদ্ধও হবে না, রমির দায়িত্বও আদায় হবে না। সালাত যেমন সময়ের আগে পড়লে তা আদায় হয় না, তেমনি রমিও সময়ের আগে করলে আদায় হয় না। [সমকালীন কোনো কোনো আলেম অবশ্য এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।] মুতাকাদ্দেমিনদের কেউ কেউ তাশরিকের দিনগুলোয় দ্বিপ্রহরের আগে রমি করার অবকাশ রেখেছেন। কারণ, নবীজি ﷺ দ্বিপ্রহরের পর রমি করেছেন বটে, কিন্তু এর আগে রমি করতে নিষেধ করেননি। আর হজ্জের মধ্যে কোনো কাজ আগ বা পর হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, ' করো। ক্ষতি নেই।' আর দ্বিপ্রহরের আগে রমি করার অনুমতি থাকলে লোকদের জন্য সহজ হয়, বিশেষ করে, এই প্রচণ্ড ভিড়ের সময়। আর আগে ইবনে উমর رضي الله عنهما-র যে হাদিসটি উল্লেখ হয়েছে, তা হল একটি আমলের বর্ণনা। তবে, উত্তম হল, রাসুল ﷺ যে বলেছেন, ' আমার থেকে তোমরা তোমাদের হজ্জের আহকাম শিখে নাও', সেটার ওপর আমল করা। আর রাসুল ﷺ দ্বিপ্রহরের পরই রমি করেছেন।

রমির সময় প্রথমে নিক্ষেপ করবে ছোটটা, এরপর মেঝোটা, এবং এরপর বড়টা। প্রত্যেক জমরার জন্য সাতটি পাথর। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবির বলবে।

সুন্নাত নিয়ম হল, ছোটটিতে রমি করে একটু আগে বাড়বে এবং সেটাকে বাম পাশে রাখবে। এরপর ক্বিবলার দিকে ফিরবে। হাত তুলে দীর্ঘ সময় দোয়া করবে। মাঝেরটাতে রমি করার পর সামনে এগোবে, এবং সেটাকে ডান দিকে রাখবে। ক্বিবলার দিকে ফিরে হাত তুলে দীর্ঘ সময় দোয়া করবে। আর জামরায়ে-কুবরার মধ্যে পাথর নিক্ষেপের পর সেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করবে না। কারণ, নবীজি ﷺ এমনই করেছেন। [সহিহ বুখারি]

রোগাক্রান্ত বা বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং গর্ভবতী বা দুর্বল মহিলারা রমি করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে কাউকে প্রতিনিধি বানাতে পারবেন। আর প্রতিনিধি প্রতিটি জামরাতে প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে সাতটি পাথরকণা নিক্ষেপ করবে। এরপর যার প্রতিনিধিত্ব করছে, তার পক্ষ থেকে সাতটি পাথরকণা নিক্ষেপ করবে।

১২ তারিখে রমি করার পর হাজি ইচ্ছা করলে মিনা থেকে চলে যেতে পারে। তবে যেতে হবে সূর্যাস্তের পূর্বে। আর চাইলে রাত্রি যাপন করে ১৩ তারিখে দ্বিপ্রহরের পর রমি করে আসবে। এটাই উত্তম। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ﴾

আর যে দুদিনের মধ্যে জলদি করে চলে যায়, তার কোনো গোনাহ হবে না। আর যে বিলম্ব করে, তারও কোনো গোনাহ হবে না, যে আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য। [সূরা বাকারা : আয়াত : ২০৩]

আর যদি ১২ তারিখে মিনা হতে রওয়ানা হতে হতে সূর্যাস্ত হয়ে যায়, তা হলে তাকে বিলম্ব করতে হবে। রাত্রিও যাপন করতে হবে, এবং ১৩ তারিখের রমিও করতে হবে।

হজ্জ শেষ করার পর কেউ যদি নিজ শহরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করে বা অন্য কোথাও সফর করার ইচ্ছা করে, তা হলে সফর করার পূর্বে তাকে বিদা' য়ি তাওয়াফ করতে হবে।

ভোর হয়েছে কি

হাসান বিন সালেহ রহিমাহুল্লাহ-র এক দাসী ছিল। একব্যক্তি তাকে কিনে নিল। নতুন মনিবের নিকট যাওয়ার পর রাতের অর্ধেক হলে বাড়িতে চিৎকার করতে শুরু করল, 'সবাই উঠো। সালাত! সালাত!' গভীর রাতে চিৎকার শুনে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভোর হয়েছে কি?' সে বলল, 'তোমরা কি ফরজ সালাত ছাড়া আর কিছু পড় না?' এরপর সে সালাতে দাঁড়িয়ে গেল।

ভোরবেলায় সে আগের মনিবের নিকট গেল। বলল, 'আমাকে তো আপনি একটি মন্দ সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রয় করেছেন। ওরা ফরজ সালাত ছাড়া অন্য সালাত পড়ে না। ফরজ সওম ছাড়া অন্য সওম রাখে না। আমাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনুন।' তিনি তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনলেন।

আমাদেরকে দেখলে ওই দাসী কী বলত? যদি দেখতে পেত, আমাদের যুগের একদল মুসলমান এমন আছে, যাদের দিনগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ তারা বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে এদিক-ওদিক করছে। রাতেও সালাত পড়ে না। ফজরের সালাতেও যায় না। তাদের অবস্থা ঠিক তেমন, যেমনটা আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا﴾

তাদের পর এল এমন একটি অকর্মণ্যের দল, যারা সালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতিশীঘ্রই তারা পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। [সূরায়ে মারয়াম : আয়াত ৫৯]

বিবিধ মাসআলা

অপ্রাপ্তবয়স্কদের হজ্জ

অপ্রাপ্তবয়স্করা যদি হজ্জ বা উমরা আদায় করে, তা হলে তা শুদ্ধ হবে এবং নফল হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, এক মহিলা নবীজি ﷺ-র নিকট একটি শিশু নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এর কি হজ্জ হবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ; সওয়াব তুমি পাবে।' [সহিহ মুসলিম]

এ কথার ওপর সবাই একমত যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে যদি কেউ হজ্জ করে নেয়, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও তার হজ্জ করতে হবে, যদি হজ্জ ফরজ হওয়ার কারণ পাওয়া যায়। আগের হজ্জ তার জন্য যথেষ্ট হবে না। উমরার ব্যাপারও তদ্রূপ।

তার ইহরাম বাঁধার নিয়ম হল, যদি তার বোধ-জ্ঞান না হয়ে থাকে, ইহরামের মর্ম না বোঝে, তা হলে তার পক্ষ হতে তার অভিভাবক ইহরাম বাঁধবে, তার পক্ষ থেকে নিয়্যত করবে। নিষিদ্ধ কাজ থেকে তাকে দূরে রাখবে; তাকে বহন করে তাওয়াফ ও সা'য়ি করবে। আরাফা, মুযদালিফা ও মিনায় তাকে সাথে রাখবে। তার পক্ষ থেকে রমি করবে।

আর যদি তার বোধশক্তি থেকে থাকে, তা হলে অভিভবাকের অনুমতিক্রমে সে নিজেই ইহরাম বাঁধবে। হজ্জের যেসব আহকাম পালন করতে পারে, করবে; আর যেগুলো পারবে না, সেগুলোর মধ্য হতে যেগুলোতে প্রতিনিধিত্ব চলে, সেগুলো তার অভিভাবক পালন করবে। যেমন রমিয়ে জিমার। তদ্রূপ সে চলতে অক্ষম হলে অভিভাবক তাকে সওয়ার করিয়ে বা বহন করে তাওয়াফ ও সা'য়ি করবে।

আর যেগুলো অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বা বালিকা নিজেই করতে পারে, চাই তার বোধশক্তি থাকুক বা না থাকুক, সেগুলো নিজেই করবে। যেমন আরাফায় অবস্থান; মুযদালিফায় রাত্রি যাপন। অন্য কেউ করলে আদায় হবে না। কারণ, এসব ক্ষেত্রে অন্য কাউকে প্রতিনিধি বানানোর প্রয়োজন নেই। আর বড়দের জন্য হজ্জের মধ্যে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ, ছোটদের জন্যও সেসব নিষিদ্ধ।

নারীদের কিছু আহকাম

নারীদের জন্য মাহরাম ব্যতীত সফর করা জায়েয নেই, চাই হজ্জের সফর হোক বা অন্য কোনো সফর। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> কোনো মহিলা মাহরাম ছাড়া সফর করবে না, এবং মাহরাম সাথে না নিয়ে কোনো পুরুষ তার নিকট যাবে না।' [মুসনাদে আহমদ]

মাহরাম হল : স্বামী, বা এমন পুরুষ, যার সাথে বিবাহ কোনো অবস্থাতেই কখনও জায়েয নেই, সব সময়ের জন্য হারাম, চাই নসবের দিক থেকে হারাম হোক, যেমন তার ভাই, পিতা, চাচা, ভায়ের ছেলে এবং মামা, চাই বৈধ কোনো কারণে হারাম হোক, যেমন

দুধভাই, চাই বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হোক, যেমন মায়ের স্বামী, স্বামীর ছেলে। সফরকালে মাহরামের খরচ তাকেই বহন করতে হবে। তাই তার ওপর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য তার নিজের ও মাহরামের আসা-যাওয়ার ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য থাকতে হবে।

ইহরামের আগে কোনো মহিলার যদি হায়েয বা নিফাস শুরু হয়, এরপর সে ইহরাম বাঁধে, কিংবা পবিত্র থাকা অবস্থায় ইহরাম বাঁধে, এরপর তার হায়েয বা নিফাস শুরু হয়, তা হলে সে ইহরামের ওপরই থাকবে। হাজিরা যেসব কাজ করে, যেমন আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফায় রাত্রি যাপন, রমিয়ে জিমার, মিনায় রাত্রি যাপন, সেসব করতে থাকবে। তবে পবিত্র হওয়ার আগে তাওয়াফ বা সা'য়ি করবে না। যদি পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করে, এবং তাওয়াফের পর হায়েয শুরু হয়, তা হলে সাফা-মারওয়ার সা'য়ি করবে। হায়েযের কারণে তা নিষিদ্ধ হবে না। কারণ, সা'য়ির জন্য পবিত্র থাকা শর্ত নয়। আর হজ্জের সময় হায়েয বন্ধ থাকার ঔষধ খেলে তা জায়েয হবে।

প্রতিনিধিত্বের [বদলি হজ্জের] আহকাম

কেউ যদি নিজে হজ্জ করতে অপারগ হয়, তবে আর্থিকভাবে হজ্জ করার সক্ষমতা থাকে, যেমন অশীতিপর বৃদ্ধ বা স্থায়ীভাবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, যার সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় না, তা হলে তার জন্য জরুরি হল, তার নিজের শহর থেকে হোক বা অন্য কোনো শহর থেকে হোক, কাউকে তার প্রতিনিধি বানিয়ে হজ্জ ও উমরা করানো। কারণ, নবীজি ﷺ-র নিকট এক মহিলা এসে বলল, 'আমার পিতার হজ্জ ফরজ হয়েছে। অথচ তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। সওয়ারের ওপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করব?' তিনি বললেন, 'তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ আদায় করো।' [সহিহ বুখারি, মুসলিম]

যিনি প্রতিনিধি হবেন, তার আগে হজ্জ আদায় করা থাকতে হবে। নবীজি ﷺ একব্যক্তিকে এ বলে তালবিয়া পড়তে শুনলেন—

لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ

'শুবরুমার পক্ষ থেকে তালবিয়া পড়ছি।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি নিজের হজ্জ আদায় করেছ?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'আগে নিজের হজ্জ আদায় করো; এরপর শুবরুমার হজ্জ আদায় কোরো।' [বায়হাকি]

প্রতিনিধিকে এ পরিমাণ মাল দিতে হবে, যেন সফরে আসা-যাওয়ার পথে তার কোনো কষ্ট না হয়। আর প্রতিনিধিরও নিয়্যত এই হওয়া চাই যে, সে তার মুসলমান ভায়ের উপকার করছে। তা হলে এই হজ্জটি আল্লাহ ﷻ-র জন্য হবে, দুনিয়ার জন্য নয়।

যার প্রতিনিধি হয়ে হজ্জ আদায় করছে, তার পক্ষ থেকেই ইহরামের নিয়্যত করবে এবং তার পক্ষ থেকেই তালবিয়া পাঠ করবে। আর আহকাম পালনের সময় মনে মনে তার পক্ষ থেকে আদায়ের নিয়্যত থাকলেই হবে, তার নাম উচ্চারণ করার দরকার নেই।

মুসলমান ব্যক্তি তার পিতামাতা উভয়ের পক্ষ থেকেই হজ্জ আদায় করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে মায়েরটা আগে করবে। সদাচরণের ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার বেশি।

কারও ওপর হজ্জ ফরজ হল। কিন্তু হজ্জ আদায় করার আগেই সে মারা গেল। তা হলে তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করাতে হবে। এক নারী নবীজি ﷺ-র দরবারে এসে আরজ করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা হজ্জ আদায় করার মান্নত করেছিলেন। কিন্তু আদায় করার আগেই মারা গেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করব?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ; তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করো। ভেবে দেখেছ, যদি তোমার মায়ের ওপর ঋণ থাকত, তুমি কি তা আদায় করতে না? আল্লাহর ঋণ আদায় করো। কথা রক্ষার আল্লাহই সবচেয়ে বেশি হকদার।' [সহিহ বুখারি]

ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ

ইহরামের কারণে যেসব কাজ নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে, যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। এমন কাজ নয়টি–

১. বিনা উযরে দেহের যে-কোনো স্থান থেকে চুল বা পশম দূর করা, কেটে হোক বা উপড়ে হোক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾

আর তোমাদের মাথা ততক্ষণ পর্যন্ত মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কোরবানি[-র পশু] যথাস্থানে পৌঁছে যায়। [সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৬]

২. নখ কাটা। তবে উপড়ে গেলে প্রয়োজনে তা ফেলে দেওয়া যাবে।

৩. পুরুষের জন্য পোশাক দ্বারা, যেমন পাগড়ি, টুপি ইত্যাদি দ্বারা, মাথা ঢাকা। তবে যদি ছাতা ব্যবহার করে, বা গাছের ছায়ায় বসে বা গাড়ির হুডের নীচে বসে, তা হলে ক্ষতি নেই।

৪. সেলাই করা জামা-পাজামা পরিধান করা। তদ্রূপ মোজাজাতীয় কোনো কিছু পরিধান করা। মুহরিম সম্বন্ধে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

মুহরিম ব্যক্তি জামা পরবে না, পাগড়ি পরবে না, বুরনুস [হুডবিশিষ্ট একধরনের ঢিলা কোট] পরবে না, পাজামা পরবে না, এমন পোশাক পরিধান করবে না, যাতে লাল বা জাফরানি রঙের মিশ্রণ রয়েছে, এবং মোজা পরবে না। [বুখারি, মুসলিম]

মহিলারা সবধরনের পোশাক পরিধান করবে, তবে নিকাব ও বোরকা পরিধান করবে না। [তা হল এমন পোশাক, যা দিয়ে মহিলা তার মুখমণ্ডল ঢাকে, এবং তাতে চোখের ওপর দুটি ছিদ্র থাকে।] বরং ওড়না বা চাদর দিয়ে সে তার মুখ ঢেকে রাখবে। আর সে মোজা পরিধান করবে না। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন-

ইহরামকারিনী মহিলা নিকাব ব্যবহার করবে না এবং মোজা পরিধান করবে না। [বুখারি]

৫. সুগন্ধ ব্যবহার করা। মুহরিম ব্যক্তির জন্য তার পোশাকে বা দেহে সুগন্ধ ব্যবহার করা হারাম। কারণ, মুহরিম ব্যক্তি সম্বন্ধে নবীজি ﷺ বলেছেন–

তাকে সুগন্ধ লাগিয়ো না। [মুসলিম]

তদ্রূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সুগন্ধের ঘ্রাণ নেবে না।

৬. স্থলভাগের প্রাণী শিকার করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾

আর তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে স্থলভাগের শিকার, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহরামে থাক। [মায়েদা : আয়াত ৯৬]

৭. নিজে বিবাহ করা বা অন্যকে বিবাহ করানো। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন–

মুহরিম ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ করাবে না। [মুসলিম]

৮. সঙ্গাম করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾

আর এ মাসগুলোয় যে হজ্জ ফরজ করল, [অর্থাৎ হজ্জ করার নিয়্যত করল] সে رَفَثْ করবে না। [সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৭]

আর এই আয়াতে رَفَثْ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, ' এর অর্থ হল সঙ্গাম।'

কাজেই যে ব্যক্তি প্রথম হালাল হওয়ার আগে সঙ্গাম করবে, তার হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে। তার জন্য চলমান হজ্জও পূর্ণ করতে হবে, এবং পরবর্তী বছর কাজাও আদায় করতে হবে। আর তার একটি পশুও জবাই করতে হবে। আর যদি প্রথম হালালের পর হয়, তা হলে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। তবে তাকে একটি বকরি জবাই করতে হবে।

৯. মহিলার সাথে মেলামেশা করা। অর্থাৎ কামনা সহকারে স্পর্শ করা, চুম্বন করা ইত্যাদি।

হজ্জ পালনকারীর জন্য এসব নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা জরুরি, যেন হজ্জে কোনোরূপ ত্রুটি না আসে। কারও থেকে নিষিদ্ধ কাজগুলোর কোনোটা ঘটে গেলে সেটার হুকুম কী, ফিদয়া দিতে হবে কি হবে না, সেটা দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। এখানে সে আলোচনার সুযোগ নেই। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা আলেমদের থেকে জেনে নিতে হবে।

পরিশেষে, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, আল্লাহ ﷻ যেন আমাদের ইবাদত কবুল করেন, আমাদেরকে যেন পুরোপুরি সুন্নাত অনুসারে চলার তাওফিক দান করেন। আল্লাহ ﷻ-ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

وَ صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ وَ بَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত
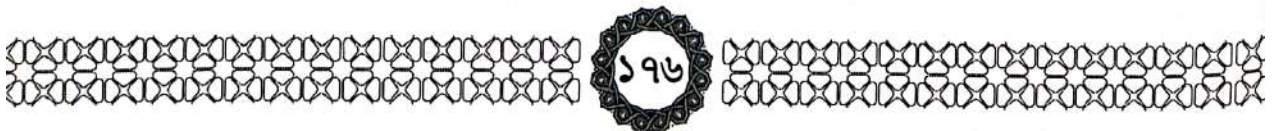
اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ
باللغة البنغالية

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শুধু তাঁরই ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদাত হল ইসলামের পাঁচ আরকান। তন্মধ্যে প্রথম রুকন তথা ঈমান সম্বন্ধে আমাদের আগের পুস্তিকা 'কবরপূজারি কাফের'-এ আলোচনা করেছি। এখানে বাকি চার আরকান তথা সালাত, যাকাত, সওম ও হজ্জ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন–

> এমনসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকর, সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে অমনোযোগী করে না। তারা ভয় করছে এমন দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে, যেন আল্লাহ তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান প্রদান করেন এবং নিজের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ করে আরও দান করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে অপরিমিত রিযিক দান করেন। [সূরা নূর : ৩৭-৩৮]

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন বইটিকে সবার জন্য উপকারী করেন এবং একান্তই তার জন্য কবুল করে নেন। আমিন!

978-984-99081-4-5
978-984-99081-4-5

বিশুদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের নতুন দিগন্ত